ষষ্ঠ সংখ্যা

রূপকথা

বাংলা ও বাঙালির কথা বলে

শক্তির আরাধনায়

সম্পাদকীয়

শুভ শক্তির উন্মেষ হোক

হিমেল হাওয়ায় শীতের পরশ লেগেছে। শরৎ পেরিয়ে হেমন্ত এসেছে। প্রকৃতিও তাই নিজের মতো করে সেজে উঠেছে, চারপাশকে সাজিয়ে তুলছে। নিয়ম মেনে বরাবরের মতো এবারও বছরের এই সময় সবাই মাতৃশক্তির আরাধনা করেন। মানুষের শক্তির আরাধনার ইতিহাস অনেক পুরোনো ও বৈশিষ্ট্যময়। এই পৃথিবীতে শক্তির উপাসনা শুরু হয় শরৎকাল থেকেই। দুর্গতিনাশিনী পুজোর মধ্য দিয়ে। এরপরই শক্তিরূপা মা কালীর আরাধনা হয়। ভক্তের বিশ্বাস, তিনিই পরমাশক্তি। একটা সময় ছিল যখন কালীপুজোর মধ্যে দিয়ে শক্তির আরাধনা করতেন তান্ত্রিক, কাপালিক ও ডাকাতরা। তাই সাধারণ মানুষ এই তান্ত্রিকদের ভয় পেতেন। মানুষের ক্ষতি করে দিতে পারে এই ভয় থেকেই তান্ত্রিকদের এড়িয়ে চলতেন। মহাশ্মশানে ভয় উদ্রেককারী কালী মায়ের ভয়াল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তান্ত্রিক বা কাপালিকদের তন্ত্র সাধনা ও শক্তির আরাধনা চলত। হত নরবলি, বশীকরণ ও অশুভ শক্তির চর্চা করে অনেকের ক্ষতি করার চেষ্টাও হত। এটাকে শক্তির আরাধনা বলা হত। আসলে এটা ছিল এক ধরনের ব্যাভিচার বা দুরাচার। আগেরকার দিনে ডাকাতরাও গহীন অরণ্যে আস্তানা গেড়ে মা কালীর পূজার্চনা করত। ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে শক্তির আরাধনায় ব্রতী হত। একটাই উদ্দেশ্য, কার্যসিদ্ধির জন্য মায়ের কাছে সাহস ও শক্তির প্রার্থনা করা। এই সব কারণেই সাধারণ মানুষের কাছে শক্তিসাধনা ঘিরে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। পরে মানুষের মনে এই অহেতুক ভয়, দ্বিধা দূর করতে পেরেছিলেন কমলাকান্ত, রাম প্রসাদ, বামাক্ষ্যাপা ও রামকৃষ্ণের মতো কালীসাধকরা। তাঁদের পূজিত কালী মা কল্যাণময়ী হিসাবে আজও পুজো পেয়ে আসছেন। তাই এই অমাবস্যায় মাতৃশক্তির কাছে একটাই প্রার্থনা, শুভ শক্তির কাছে অশুভ শক্তির পরাজয় ঘটে।

সূচিপত্র

শুরুর পাতা	৩-১৪
চেনা মানুষ অজানা কথা	১৫-১৬
কবিতা	১৭-১৮
বিশেষ রচনা	১৯
কর্পোরেট	২০
স্বনিযুক্তি	২১-২২
আলাপন	২৩-২৫
ফ্যাশন	২৬
হেঁসেল	২৭
পিকনিক	২৮
খেলা	২৯
বিনোদন	৩০

রূপকথা

প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা

প্রধান সম্পাদক

মানসকুমার ঠাকুর

নির্বাহী সম্পাদক

সৈকত হালদার

সহ-সম্পাদক

ঈপ্সিতা সেন

সহযোগী -- **মধুমিতা দাস**

পরিচালনা

মানসী রিসার্চ ফাউন্ডেশন

অক্ষরবিন্যাস **ইন্দ্রবুবলি**

প্রচ্ছদ **কুন্তল**

সদানন্দময়ী মা

তনুশ্রী চক্রবর্তী

বিশ্বামিত্র নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ভ্রমণ করতে করতে একদিন বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। বশিষ্ঠদেব তাঁকে সাদরে সংবর্ধনা জানালেন। ফলমূল দিয়ে পুজো করলেন। সসৈন্য আতিথেয়তা গ্রহণ করতে অনুনয় করলেন। পুনঃ পুনঃ অনুনয় করায় রাজা বিশ্বামিত্র অনুরোধ গ্রহণ করলেন। অনন্তর বশিষ্ঠদেব তাঁর কামধেনু শবলাকে ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি ষড়রস সৃষ্টি করতে বললেন। কামধেনু শবলা নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য সৃষ্টি করল। বশিষ্ঠদেব তা দিয়ে সসৈন্য বিশ্বামিত্রের অতিথি সৎকার করলেন।

কামধেনুর কাণ্ড দেখে অবাক হলেন রাজা। বশিষ্ঠদেবের কাছে রাজা বিশ্বামিত্র কামধেনু প্রার্থনা করলেন। বললেন, লক্ষ গাভী তিনি মুনিকে দেবেন। বশিষ্ঠদেব রাজি হলেন না। বিশ্বামিত্র হাজার হাজার হাতি, ঘোড়ার বিনিময়ে কামধেনু প্রার্থনা করলেন। বশিষ্ঠদেব তাতেও রাজি হলেন না। বিশ্বামিত্র বলপূর্বক কামধেনুকে নিয়ে যেতে চাইলে শবলা বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞেস করল, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে প্রভু?

বশিষ্ঠ মুনি বললেন, তোমাকে পরিত্যাগ করিনি। বলপূর্বক তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি বলহীন।

শবলা বলল, তুমি কি জানো না ব্রাহ্মণের বল সর্বজনবিদিত। আমাকে অনুমতি দিলে বিশ্বামিত্রের সব দর্প খর্ব করে আত্মতৃপ্ত হই।

বশিষ্ঠদেব অনুমতি দিলে শবলা নিজ সৃষ্ট সৈন্য দ্বারা বিশ্বামিত্রের সব সেনা ধ্বংস করে দেয়।

তখন রাজা বিশ্বামিত্র শিবের তপস্যা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করলেন। এরপর প্রচুর অস্ত্র নিয়ে বশিষ্ঠদেবকে আক্রমণ করেন। বশিষ্ঠদেব একটি দণ্ড উত্তোলন করে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিশ্বামিত্রের একটিও অস্ত্র বশিষ্ঠদেবকে স্পর্শ করতে পারল না। তখন বিশ্বামিত্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন— ব্রহ্মবলই প্রকৃত বল। অতঃপর ব্রহ্মাস্ত্র লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করতে বসলেন।

বিশ্বামিত্র সকল দেবগণের আরাধনা করেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারলেন না। তাঁর অসীম আগ্রহ দেখে সুরশ্রেষ্ঠ দেবগুরু বৃহস্পতি শিবের আরাধনা করতে বললেন তাঁকে।

আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব দর্শন দিলেন। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব বর চাইলে শিব কালীকার একাক্ষরী মহাবিদ্যা জপ করতে বললেন। বিশ্বামিত্র আরাধনা করে সিদ্ধিলাভ না করায় ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে 'অনারাধ্যা হও'— এই বলে বিদ্যাকে শাপ দিলেন। সেই মুহূর্তে শিব তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন— বিদ্যাকে কেন শাপ দিলে? পুনরায় সেই মন্ত্র জপ

করতে বললেন।

বিশ্বামিত্র সাধনায় বসলেন। সিদ্ধিলাভ করলেন। কালীর বরে তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করলেন।

এ তো মহাকালীর কৃপা। মহাসংহার সময়ে কাল সকলকে গ্রাস করে। তাই মা কালী নামে পরিচিতা। দশমহাবিদ্যার আদ্যা বিদ্যা হলেন কালী। মা শবারুঢ়া মা ভয়ঙ্করী ত্রিনয়না সহাস্যবদনা বরদায়িনী। যাঁর কেশদাম আলুলায়িত লৌল জিহ্বা রুধির পানরতা দুই হস্তে বর এবং অভয় মুদ্রা ধারণ করে আছেন।

মা শ্যামবর্ণা দিগম্বরী কণ্ঠদেশে মুণ্ডমালা, কটিদেশে শবের হস্তসমূহ নির্মিত কাঞ্চী বিরাজমানা।

শ্মশানভূমিতে যাঁর বাস। মা মুণ্ডমালাবিভূষিতা স্তনদ্বয় উন্নত ভীষণাদন্ত মহাকালের হৃদয়ে দণ্ডায়মান। দুটি মৃত শিশুর দ্বারা কর্ণাভরণ করেছেন। ভয়ঙ্করী মূর্তি। তার ভিতরে আছে মায়ের স্নেহময়ী রূপ। কলিতে কালিকা মোক্ষদাত্রী।

ডুব দে রে মন কালী বলে। এই ডাকে মা জেগে ওঠেন।

রামপ্রসাদ মা কালীর পরম ভক্ত। একদিন তিনি বেড়া দিচ্ছেন আর গান করছেন।

'তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও কুলকুণ্ডলিনী কূলে।

রতন মাণিক্য কত পড়ে আছে সেই জলে। ডুব দে রে মন কালী বলে।

মানুষের যুষুম্নানাড়ী সর্ব প্রধান নাড়ী। যোগীদের ধ্যানকক্ষ। যেখানে বিভিন্ন দলসমন্বিত রূপকপদ্ম প্রস্ফুটিত। যোগীগণ ধ্যানের দ্বারা এই জ্যোতিরূপ করে ব্রহ্মরূপিনীর সঙ্গে একীভূত হতে সমর্থ হন। রূপে রূপে অপরূপা মায়ের সাধনা বিভিন্ন স্থানে হয়ে থাকে। শব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন সর্বানন্দ। শব সাধনা কঠিন এবং দুর্লভ। পঞ্চতত্ত্বের সাধনা বীর ভাবের সাধনা। মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা মৈথুন।

বিভিন্ন গ্রন্থে এই বিষয়ে বহু তথ্য পাওয়া যায়।

মুণ্ডক উপনিষদে উল্লেখ আছে অগ্নির প্রচণ্ড তেজযুক্ত জিহ্বা। তার একটির নাম কালী। কালী এখানে অগ্নিজিহ্বা মাত্র। যিনি আহুতি গ্রহণ করেন।

ঋকবেদে বলা হয়েছে রাত্রিদেবী নক্ষত্রমালায় ভূষিত করেছেন। তিনিই কালীরূপে নিজেকে প্রকাশ করছেন। রামায়ণে মহাভারতেও কালীসাধকের পরিচয় পাওয়া যায়।

কালিকাপুরাণে আছে— শুম্ভ অশুম্ভ নামে দুই অসুর যখন দেবলোক এবং পৃথিবী জুড়ে অত্যাচার শুরু করেছে তখন দেবতারা এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের কাছে যান এবং তাদের উপদেশে আদ্যাশক্তি মহামায়ার উপাসনা শুরু করেন। মহামায়া দেবতাদের বরাভয় প্রদান করেন এবং অসুর নিধন করতে উদ্যত হন। তিনি তাঁর রুদ্ররূপ ধারণ পূর্বক অসুর নিধনে ব্রতী হন। শুম্ভ নিশুম্ভ পরাজিত হলে তাদের সেনাপতি রক্তবীজ আসেন যুদ্ধ করতে। রক্তবীজকে পরাজিত করা অসম্ভব। কারণ সে ব্রহ্মার বরে পুষ্ট। ব্রহ্মা তাঁকে যে বর দান করেছিলেন তাতে কোনো দেবদেবী তাঁকে হত্যা করতে পারবেন না। যাঁর এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়লে হাজার হাজার অসুর সৃষ্টি হবে। এই ঘটনায় মা মহামায়া আরো ক্রোধান্বিত হন। তাঁর দুই ভ্রূযুগলের মধ্যে থেকে এক ভয়াবহ মূর্তি বেরিয়ে আসে এবং একের পর এক অসুর নিধন করতে থাকেন। রক্তবীজকে ওপরে তুলে নেন। তাঁর মস্তক ছেদন করে এবং সেই রক্ত নিজেই পান করতে থাকেন। অসুরদের মস্তক নিয়ে মুণ্ডমালা বানিয়ে গলে পরিধান করেন।

এই মা 'কালী' নামে সর্বজনবিদিত।

যিনি বিশালবদনা অতিভীষণা নরমুণ্ডমালিনী নরকঙ্কালধারিনী ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা আরক্ত চক্ষুবিশিষ্ঠা বিকট শব্দে দিকমণ্ডল পূর্ণকারিণী।

জীবের অজ্ঞানরূপ মহাশত্রু কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যরূপ শত্রু সংহার করার জন্য মায়ের এই রূপে আবির্ভাব। আবার স্নেহময়ী প্রেমময়ী মা হয়েই তিনি সন্তানকে কোলে করে স্তন্যপান করান। মা সচ্চিদানন্দময়ী।

কালীর ভিন্ন রূপের আখ্যান

সমুদ্র সেন

কলকাতা সহ এই রাজ্যে এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে কালী মন্দির নেই বা কালী পুজো হয় না। প্রতিদিন সেই মন্দিরে যেমন ভক্ত সমাগম হয়, তেমনই ভক্তি ভরে পুজোও হয়। এখানে একটা প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক। দেবী কালীর রূপের এতরকম বৈশিষ্ট্য কেন? কেনই বা মা কালী বিভিন্ন মন্দির ও জায়গায় আলাদাভাবে পুজো পান।

বলা হয়, মা কালীর সৃষ্টি স্বয়ং মা দুর্গার থেকেই। মূলত, হিন্দুধর্মে মহাশক্তির যে পুজো হয়, তা মাতৃকা নামে পরিচিত। এই মাতৃকা নামক মহাশক্তির সাতটি রূপ রয়েছে। তাঁরা হলেন- ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী, ইন্দ্রাণী, কৌমারী, বারাহি ও চামুণ্ডা। এই চামুণ্ডা হলেন, দেবীর ভয়ঙ্কর রূপ। কালী নামের উৎস নিয়েও নানারকম মতভেদ রয়েছে। যেমন-দেবী কৃষ্ণবর্ণ বলেই কালী বা কালিকা নামে পরিচিতা। আবার উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃত ভাষার অভিধান শব্দকল্পদ্রুমে বলা আছে, শিবই কাল বা মহাকাল। তাঁর পত্নী কালী। উনি মহাদেবের শরীরে প্রবেশ করে তাঁর কণ্ঠের বিষে কৃষ্ণবর্ণ হয়েছেন। পাণিনি অনুযায়ী, কালী শব্দটি কাল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ, যার অর্থ কৃষ্ণ, ঘোর বর্ণ। মহাভারত অনুসারে, কালী দুর্গার একটা রূপ। আবার হরিবংশ গ্রন্থে কালী একজন দানবীর নাম।

প্রথমবার কথক গ্রাহ্য সূত্রে দেবী কালীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কালীর বর্তমান রূপের উপস্থিতি আমরা পাই মহাভারতের সুপ্তিকা পার্বণে। ষষ্ঠ শতাব্দীর দেবী মাহাত্ম্য কালীকে 'রক্তবীজ' নামে অসুরকে হত্যা করতে দেখা যায়। দশম শতাব্দীর 'কালিকা পুরাণে' কালীর স্তুতি করা হয়।

১৮৭৭ সালে কাশীনাথ রচিত 'শ্যামাসপর্যায়বিধি'তে কালীপুজোর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাংলায় প্রথম কালীপুজোর প্রচলন করেন। উনবিংশ শতাব্দী থেকে কালীপুজো বাংলার প্রায় সব জায়গায় হতে শুরু করে।

দেবী কালীর মূলত আটটি রূপের উপাসনা আমরা করে থাকি। যা তোড়ল তন্ত্র মতে, অষ্টধা বা অষ্ঠবিধ নামে পরিচিত। এরা হলেন- দক্ষিণাকালী, সিদ্ধকালী, গুহ্যকালী, মহাকালী, ভদ্রকালী, চামুণ্ডাকালী, শ্মশানকালী ও শ্রীকালী। প্রধানত শাক্ত ধর্মাবলম্বীরা কালীর পুজো করেন। দশমহাবিদ্যা নামে পরিচিত তন্ত্রমতে পূজিত প্রধান দশজন দেবীর মধ্যে প্রথম দেবী হলেন কালী। পুরাণ ও তন্ত্রগ্রন্থগুলিতে কালীর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। সাধারণভাবে তাঁর মূর্তিতে চারটি হাতে খড়্গ, অসুরের ছিন্নমুণ্ড, বর ও অভয়মুদ্রা, গলায় নরমুণ্ডের মালা, বিরাট জিভ, কালো গায়ের রং ও শিবের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আবার ব্রহ্মযামল মতে, কালীর বিভিন্ন রূপভেদ রয়েছে। যেমন, দক্ষিণাকালী, শ্মশানকালী, ভদ্রকালী, রক্ষাকালী, গুহ্যকালী, মহাকালী, চামুণ্ডা ইত্যাদি। বিভিন্ন মন্দিরে ব্রহ্মময়ী, ভবতারিণী, আনন্দময়ী, করুণাময়ী নামে পুজো করা হয়। আশ্বিন মাসের অমাবস্যা তিথিতে দীপান্বিতা কালীপুজো করা হয়।

দক্ষিণাকালী

বঙ্গদেশে সবথেকে বেশি আরাধনা করা হয় দক্ষিণাকালীর। উনি জায়গা ভেদে শ্যামাকালী নামেও পরিচিত। সারা শরীর নীল রঙের, তাঁর মূর্তি ক্রুদ্ধ, ত্রিনয়নী, মুক্তকেশ, চার হাত, গলায় মুণ্ডমালা। বাম দিকের দুই হাতে নরমুণ্ড ও খড়্গ। ডানহাতে থাকে আশীর্বাদ ও অভয় মুদ্রা। মহাদেবের ওপর দণ্ডায়মান। দেবীর গলায় পিশাচদের কাটা মাথা দিয়ে বানানো হার শোভা পায়। দুটি শব তাঁর কানের গয়না, কোমরে নবহস্তের কটিবাস।

সিদ্ধকালী

সিদ্ধকালী ভুবনেশ্বরী নামেও পরিচিত। এই দেবীকে গৃহস্থের বাড়িতে পুজো করা হয়। মূলত, কালী মায়ের সাধকরা এই পুজো করে থাকেন। সিদ্ধকালীর দুটি হাত। শরীর গয়নায় আবৃত, তাঁর ডান পা শিবের বুকে ও বাম পা মহাদেবের দুপায়ের মাঝখানে। এই দেবী রক্ত নয়, বরং অমৃত পানে খুশি থাকেন।

গুহ্যকালী

গুহ্যকালি বা আকালীর রূপ ভয়ঙ্কর। তাঁরও গায়ের রং গাঢ় মেঘের মতো, দুটো হাত, গলায় পঞ্চাশটা নরমুণ্ডের মালা। কোমরে কালো-বস্ত্র। মাথায় জটা ও অর্ধচন্দ্র, কানে শবদেহের অলঙ্কার ও নাগাসনে উপবিষ্টা। এই দেবীর বামপাশে মহাদেবকে বৎসরূপে দেখা যায়।

মহাকালী

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে মহাকালীকে আদ্যাশক্তি রূপে কল্পনা করা হয়েছে। তাঁর দশ হাতে রয়েছে খড়্গ, চক্র, গদা, ধনুক, বাণ, পরিঘ, শূল, ভুষুণ্ডি, নরমুণ্ড ও শঙ্খ।

ভদ্রকালী

ভদ্রকালী নামটি অবশ্য শাস্ত্র মতে দুর্গা ও সরস্বতী দেবীর অন্য নাম। ভদ্রকালীর গায়ের রং নীল, মাথায় জটা। হাতে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।

চামুণ্ডাকালী

চামুণ্ডাকালী বা চামুণ্ডা ভক্ত ও সাধকদের কাছে কালীর এক প্রসিদ্ধ রূপ। পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী, চামুণ্ডা চণ্ড ও মুণ্ড নামের দু'জন অসুরকে বধ করেছিলেন। তাঁর গায়ের রং নীল, পরিধানে বাঘছাল। দুর্গাপুজোর মহাষ্ঠমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণে আয়োজিত সন্ধিপুজোর সময় দেবী চামুণ্ডার পুজো করা হয়।

শ্মশানকালী

কালীর এই রূপের পুজো সাধারণত শ্মশানঘাটে হয়। শ্মশানকালী দেবীর গায়ের রং কালো। তাঁর চোখ দুটো রক্তের মতো লাল। বাম হাতে মদ ও মাংসে ভরা পাত্র, ডান হাতে নরমুণ্ড। শ্মশানকালীর আরেকটি রূপে তাঁর বাম পা'টি শিবের বুকে স্থাপিত ও ডান হাতে ধরা খড়্গ। এই রূপই ভয়ঙ্কর। সেকালের ডাকাতরা ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে শ্মশানঘাটে নরবলি দিয়ে শ্মশানকালীর পুজো করতেন। তন্ত্র সাধকরা মনে করেন, শ্মশানে শ্মশানকালী পুজো করলে সিদ্ধ হওয়া যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংসের স্ত্রী সারদা দেবী দক্ষিণেশ্বরে শ্মশানকালীর পুজো করেছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছিলেন, শ্মশানকালীর ছবিও গৃহস্থের বাড়িতে রাখা উচিত নয়।

শ্রীকালী

কথিত আছে, শ্রীকালী দারুক নামক অসুর নাশ করেন। ইনি মহাদেবের শরীরে প্রবেশ করে তাঁর কণ্ঠের বিষে কৃষ্ণবর্ণ হয়েছেন। শিবের মতো ইনিও ত্রিশূলধারিণী ও সর্পযুক্তা।

দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী

অরুণা পুরকাইত

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দেবী কালীকাকে 'ভবতারিণী' নামে পুজো করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট যোগী রামকৃষ্ণ পরমহংস এই মন্দিরে কালীসাধনা করতেন। এই মন্দির সারা বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। মন্দিরটি গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছে এক ইতিহাস। ১৮৪৭ সালে ধনী বিধবা জমিদার রানি রাসমণি দেবী অন্নপূর্ণা পুজোর জন্য কাশীতে যাওয়ার আয়োজন করেন। ২৪টি নৌকায় আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী ও রসদ নিয়ে তিনি রওনাও হন। কিংবদন্তি অনুসারে, যাত্রার আগের রাতে রানি রাসমণি দেবী মা কালীর স্বপ্নাদেশ পান। দেবী তাঁকে বলেন, 'কাশীতে যাওয়ার দরকার নেই। গঙ্গাতীরেই একটি নয়নাভিরাম মন্দিরে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুজো কর। সেই মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েই আমি পুজো গ্রহণ করব।'

এই স্বপ্নের পরই রানি অবিলম্বে গঙ্গাতীরে জমি কেনেন ও মন্দির তৈরির কাজ শুরু করেন। ১৮৪৭ সালে এই বিরাট মন্দির তৈরির কাজ শুরু হয়, যা শেষ হয় ১৮৫৫ সালে। মন্দিরের ২০ একরের প্লটটি জন হেস্টি নামে এক ইংরেজের কাছ থেকে কেনা হয়। লোকমুখে জায়গাটি পরিচিত ছিল সাহেবান বাগিচা নামে। এর একটি অংশে ছিল কচ্ছাপাকার মুসলমান গোরস্থান। তাই তন্ত্রমতে স্থানটি শক্তি উপাসনার জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। আট বছরে ৯ লাখ টাকা খরচে এই মন্দির তৈরি হয়। ১৮৫৫ সালের ৩১ মে স্নানযাত্রার দিন মহাসমারোহে মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। আগে মন্দিরের আরাধ্যাকে মাতা ভবতারিণী কালিকা নামে অভিহিত করা হয়েছিল। রামকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রধান পুরোহিত পদে নিযুক্ত হন। তাঁর ছোটো ভাই গদাধর বা গদাই সহযোগী হন। পরে তাঁর ভাগ্নে হৃদয়ও সাহায্য করতেন। রামকুমারের দেহরক্ষার পর গদাধর প্রধান পুরোহিতে পদে আসেন। প্রায় ৩০ বছর শ্রীরামকৃষ্ণ এই মন্দিরে ছিলেন। তাঁর সময় থেকে এই মন্দির তীর্থক্ষেত্র হয়ে ওঠে। মন্দিরটি বাংলার স্থাপত্যশৈলীর বা গৌড়ীয় স্থাপত্যের ধারায় তৈরি হয়, মূল মন্দির ৩তলা। ওপরের দু'টি

তলায় নয়টি চূড়া রয়েছে। মন্দির দক্ষিণমুখী। একটি উত্তোলিত দালানের ওপর গর্ভগৃহটি স্থাপিত। এই দালানটি ৪৬ বর্গফুট চওড়া ও ১০০ ফুট লম্বা। গর্ভগৃহে শিবের বুকের ওপর ভবতারিণী নামে কালীমূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত। এই দুটি মূর্তি একটি রুপোর সহস্রদল পদ্মের ওপর স্থাপিত। মূল মন্দিরের কাছে যে বারোটি একই প্রকার দেখতে পূর্বমুখী শিবমন্দির রয়েছে সেগুলো আটচালা স্থাপত্যরীতিতে তৈরি। গঙ্গার একটি ঘাটে দু'ধারে এই মন্দিরগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে। মন্দির চত্বরে একটি রূপার সিংহাসনে সাড়ে একুশ ইঞ্চির কৃষ্ণ ও ষোলো ইঞ্চির রাধামূর্তি প্রতিষ্ঠিত। রানি রাসমণির গৃহদেবতা (রঘুবীর), জনার্দন (কৃষ্ণ) ও নাড়ু-গোপাল দক্ষিণেশ্বরে অধিষ্ঠান করছেন। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি কলকাতার অদূরে হুগলি নদীর তীরে রয়েছে। এটা উত্তর ২৪ পরগনার কামারহাটিতে।

জঙ্গিপুরের ৪৫০ বছরের বাম কালী আজও রীতি মেনে পূজিত হন

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরের জরুর গ্রামে ৪৫০ বছরের কালীপুজো হয়। জরুর বনেদি গ্রাম। বেশ কয়েক পুরুষ ধরে রামদুর্লভ রায়ের বংশধরদের বাস এই গ্রামে। জমিদারি ছিল এই রায়দের। মুর্শিদাবাদের একাংশ ও বীরভূমের লতাগ্রামের লাগোয়া এলাকা জুড়ে তাঁদের জমিদারির দখল ছিল। কুলদাপ্রসাদ রায়, গিরীজাভূষণ রায়, শশীভূষণ রায় প্রমুখ জমিদাররা সুনাম ও দাপটের সঙ্গে জমিদারি পরিচালনা করতেন। শোনা যায়, এই রায় পরিবারের জমিদারি আমলে প্রজারা খুব সুখে ছিলেন। ঠিক একইভাবে এখনও গ্রামের সব মানুষ এই রায় পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান রেখে বাস করছে। রায়দের জমিদারি চলাকালীন তাঁদের কুটুম্ব মল্লিক ও সেন পরিবারও ওই গ্রামে বসবাস শুরু করে। পরে জরুর গ্রামে বর্ধিষ্ণু পরিবার হিসাবে রায়-সেন-মল্লিক পরিবারের পরিচিতি বাড়ে। এখনও তা অক্ষুন্ন। এই তিন পরিবারই বহু প্রাচীন কালীপুজোর সেবায়েত। এই কালী পুজো বাম কালী পুজো নামে পরিচিত। কার্তিক মাসের দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীপুজোর রাতে এই বাম কালী পুজোকে কেন্দ্র করে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। মানুষের বিশ্বাস, 'মা বাম কালী' খুব জাগ্রত ও ভক্তের সব মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন।

এই বামকালী পুজোর শুরুটা বড়োই অদ্ভুত। আনুমানিক ৪৫০ বছর আগের কথা। গ্রামের রাখাল বালকের দল খেলাচ্ছলে মা কালী পুজোর উদ্যোগ নেয়। মাটি ও গোবর দিয়ে কালী মূর্তির মতো একটা পুতুল গড়তে গিয়ে ভুলবশতঃ বাম পা আগে তৈরি করে ফেলে। সেই কারণেই এই কালী 'বামকালী' নামে খ্যাত। এদিকে, ছেলেরা খেলাচ্ছলে কালীপুজো করতে গিয়ে যে যে রীতির পালন করেছিল আজও তা মেনে চলা হয়। বনফুলের মালা দেওয়া হয়েছিল কালী মূর্তির গলায়। এখন মোম দিয়ে বানিয়ে বিভিন্ন রঙ দিয়ে

মা বামকালীর গলায় যে মালা পরানো হয় তা ওই বনফুলের মালার রীতি বহনকারী। রাখাল দলের মধ্যে গ্রামের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের সন্তানরা ছিল। ঠিক এই রীতি মেনে জরুর গ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষের মেলবন্ধনে পূজিত হন মা বামকালী। শোনা যায়, রাখাল ছেলের দল খেলাচ্ছলে কালীপুজো করতে করতে পুজো অসমাপ্ত রেখে চলে যায়। পরে রায় পরিবারের রামদুর্লভ রায়ের এক বংশধর স্বপ্ন দেখেন, ওই অসমাপ্ত কালীপুজো একই রীতি মেনে শেষ করতে হবে। সেই অনুযায়ী রায় পরিবারের ওই সময়ের জমিদারের উদ্যোগে মহাসমারোহে মা বামকালীর পুজো শুরু হয়। একই রীতি মেনে তখন থেকে মা বামকালীর পুজো জরুর গ্রামে হয়ে চলেছে। এখন মা বামকালীর বিশাল মূর্তি প্রচুর স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা। মা বামকালীর জাগতরূপ। সারারাত ধরে নিয়মনিষ্ঠা মেনে পুজো শেষ হওয়ার পর পরেরদিন সকালে হয় 'ষোলোকলা পুজো'। অনেক ভক্ত সমাগম হয় ষোলোকলা ডালা নিয়ে মা বামকালীর চরণ স্পর্শ করার জন্য। পরের দিন রাতে গ্রাম প্রদক্ষিণের পর প্রতিমা বিসর্জন হয়। কাঠামো মন্দিরের বেদিতে বারোমাস পূজিত হয়। পুজোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বছর তিনেক আগে একটি ট্রাস্ট তৈরি করা হয়। রায়-সেন-মল্লিক পরিবারের সদস্যরা ওই পুজোর মূল সেবায়েত, তাঁরা ওই ট্রাস্টের সদস্য এবং পরিচালকমণ্ডলীও। এখন রায় বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য আশিস কুমার রায় ট্রাস্টের চেয়ারম্যান। প্রবীণ সদস্য ডঃ শিশির রায় ও কোষাধ্যক্ষ শৈবাল মল্লিকের সুচারু ব্যবস্থাপনায় জরুর গ্রামে মা বামকালীর পুজো হয়। প্রতিবারের মতো এবারও মা আসছেন। ভক্তরা মা বামকালীর আরাধনায় ব্রতী হওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে দিন গুনছেন।

লালগোলার শিকল কালী মন্দিরের মাহাত্ম্য আজও উজ্জ্বল

সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শিকল কালী মন্দির এই রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলার একটি প্রাচীন ঐতিহ্যশালী মন্দির। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে লালগোলা একটা বড়ো অঞ্চল ছিল। এখন লালগোলার বেশ কিছু গ্রাম ও অঞ্চল বাংলাদেশের মধ্যে চলে যায়। প্রাচীন লালগোলার একটি গ্রাম হল দেবীনগর। লালগোলা কালী বাড়িতে যে মূর্তি রয়েছে সেরকমই একটি কালী মূর্তির পুজো করতেন ওই গ্রামের চাঁই মণ্ডল গ্রামবাসীরা। দেবীনগর গ্রামে যে মূর্তিটি ছিল সেটি আসলে বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার মণ্ডল গ্রামের বর্ধিষ্ণু ভট্টাচার্য পরিবারের ছিল। সেখান থেকে ডাকাতের একটি দল ওই মূর্তি তুলে নিয়ে এসে দেবীনগর গ্রামের এক বটবৃক্ষের নীচে প্রতিষ্ঠা করে। ডাকাত দলের পরে সেখানকার অধিবাসীরা ওই কালী মূর্তির পুজো করতেন। ওই সময় একদিন লালগোলার রাজা রাম শংকর রায় দেবীনগর বেড়ানোর সময় মূর্তিটি দর্শন করেন। মূর্তিটি একটি গাছের তলায় প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে মূর্তিটিরও প্রায় ভগ্নাবশেষ দেখেছিলেন রাজা রাম শংকর রায়। গ্রামের বাসিন্দারা তখন রাজার কাছে দাবি করেন কালী মূর্তিটির জন্য কোনো মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দিতে হবে।

সেই সময়ের লালগোলাই এখন কলকলি,

পদ্মানদীর শাখা নদী হয়ে বইছে লালগোলা রাজবাড়ির পাশ ধরে। রাজা রাম শংকর রায় একদিন রাতে স্বপ্ন দেখেন, ওই কালী লালগোলার রাজবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছেন। রাজা ভোরবেলায় কলকলির বাঁধানো ঘাটে গিয়ে দেখেন, সেখানে একটি মূর্তির কাঠামো ভাসছে। কাঠামো তুলে রাজবাড়িতে নিয়ে আসা হয়। রাজা রাম শংকর রায় বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার মণ্ডল গ্রামে বর্ধিষ্ণু ভট্টাচার্য পরিবারকে খুঁজে বের করতে লোক পাঠান। ভট্টাচার্য পরিবারের খোঁজ মেলে। পরিবার থেকে আসেন পণ্ডিত ত্রৈলোখ্য ভট্টাচার্য। রাজা তাঁর কাছ থেকে দেবীনগরের কালী মূর্তির কথা সবিস্তারে শোনেন। সেই সঙ্গে কলকলির ঘাট থেকে পাওয়া কাঠামো দিয়ে দেবীনগরের কালী মূর্তির মতো মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। শুরু হয় একইরকম মূর্তি তৈরির কাজ।

পণ্ডিত ত্রৈলোখ্য ভট্টাচার্য রাজাকে জানান, তাঁদের প্রতিষ্ঠিত মা কালীকে ডাকাতরা তুলে নিয়ে গিয়ে দেবীনগর গ্রামে পুজো করছিলেন। সেই মায়ের তাঁরা চার শরিক। তিন শরিকের নাম ছিল সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য,পঞ্চানন ভট্টাচার্য ও অমর ভট্টাচার্য। এরা প্রত্যেকেই বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার মণ্ডল গ্রামের বাসিন্দা। রাজা রাম শংকর রায় পণ্ডিত ত্রৈলোখ্য ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রত্যেক শরিক ৩ মাস করে পুজো করবেন এই মর্মে পুরোহিত হিসেবে রাখেন। শুরু হয় লালগোলার কালী মায়ের আরাধনা।

পণ্ডিত ত্রৈলোখ্য ভট্টাচার্য বিদ্বান ছিলেন। মহারাজা রাও শ্রী যোগীন্দ্র নারায়ণ রায়ের আমলে উনি সভা পণ্ডিতের আসন গ্রহণ করতেন। দ্বিতীয় শরিক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন গুণী ও সংস্কৃতের শিক্ষক। তৃতীয় শরিক পঞ্চানন ভট্টাচার্য পণ্ডিত ধর্মদাস পণ্ডিতের বাবা ছিলেন। চতুর্থ শরিক অমর ভট্টাচার্যও ছিলেন সংস্কৃতের শিক্ষক।

লালগোলার রাজার প্রতিষ্ঠিত কালী মায়ের বাড়ি আজ লালগোলার হেরিটেজ। দারুকাঠ নির্মিত কালীবিগ্রহ নৃত্যরতা ও শিবের বুকের ওপর দণ্ডায়মান অবস্থায় নির্মিত। মূর্তিতে কোন নরমুণ্ড নেই। নীচের হাত দুটি জোড়বদ্ধ। দু'পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী, সামনে কামদেব ও রতিদেবী। চামর হাতে কিন্নর ও কিন্নরী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। কথিত আছে, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময় ১০৮টি ছাগল বলি দেওয়া হয়। ওই সময় কালীমূর্তি বলিকাঠের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুরোহিত বিগ্রহের দু'হাতে শিকল বেঁধে দেন। লালগোলার এই মন্দিরে বসে শিকল দিয়ে বাঁধা কালী মাকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের প্রথম গ্র্যাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখেন, 'বন্দেমাতরম'। এই মন্দিরে আসেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামও। তিনি মন্দিরে বসে কত যে শ্যামা সঙ্গীত গেয়েছেন তার হিসেব নেই। ৮০-৯০ দশকের প্রখ্যাত ফুটবলার ভাস্কর ব্যানার্জি তাঁর

ফুটবল সেশন শুরুর আগে লালগোলা কালী বাড়িতে পুজো দিতে আসতেন। লালগোলার ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হোল্ডার ওয়াকার তীর্থ কুমার ফণী নিজের জীবনীতে লিখেছেন, তাঁর যত শক্তি ও অনুপ্রেরণা লালগোলার কালী মায়ের কাছে এসে উদ্বুদ্ধ হয়ে পেয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তথা লালগোলার বাসিন্দা গুণেন্দ্র নারায়ণ রায় নিজের চেয়ারে বসার আগে লালগোলার মায়ের ছবিতে প্রণাম করে বসতেন। রণেন্দ্র নারায়ণ রায় লালগোলার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। কুখ্যাত মাফিয়া রশিদ খানের রায় তাঁর হাত দিয়েই বেরিয়েছিল। রায় বেরোনোর দু'দিন আগে তিনি লালগোলা কালী বাড়িতে এসে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে যান। মুর্শিদাবাদের এই কালীমন্দির নানা ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে আজও ঐতিহ্যের সঙ্গে রয়েছে।

বীরসিংহপুরের রাজা বীরসিংহের মগধেশ্বরী কালী আজও বিরাজিত

পিকলু বসু

উত্তরপ্রদেশের রাজকুমার ভাগ্যের ফেরে বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। এরপর তাঁর ওপর মা কালীর কৃপা হয়। কালীর কৃপায় বীরসিংহ রাজ্য গড়লেন। বীরভূমের বীরসিংহপুরে গেলে লোকের মুখে মুখে এই কথা শোনা যায়। অনেক আবার বলেন, বীরসিংহ অন্য কোনো প্রদেশ থেকে এখানে আসেননি, তিনি এই বাংলারই মানুষ ছিলেন।

৮০০ বছর আগের বাংলায় পশ্চিম ভারত থেকে তিনজন রাজপুরুষ ঘোড়ায় চড়ে এদেশে পালিয়ে আসেন। এক অত্যাচারী ইসলামি দস্যু তাঁদের বাবাকে খুন করে রাজ্য কেড়ে নেয়। এই তিন রাজকুমার হলেন বীরসিংহ, চৈতন্যসিংহ ও ফতেসিংহ। তাঁরা পালিয়ে এসে বাংলার বীরভূম জেলার এক গণ্ডগ্রামে আশ্রয় নেন। ওই অঞ্চল ও তার আশপাশের বাসিন্দাদের সঙ্গে তিন রাজকুমার বন্ধুত্ব করে সবার হৃদয় জয় করে নেন। ধীরে ধীরে বন্ধুদের সাহায্যে বিরুদ্ধবাদীদের হারিয়ে তিনজনে তিনটি আলাদা জনপদের রাজা হন। রাজা বীরসিংহ নিজের নামে তাঁর রাজধানীর নাম বীরসিংহপুর রাখেন। বীরসিংহপুর বীরভূমের এক জনপল্লি। বর্ধমানের অণ্ডাল জংশন থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে বীরভূমের সদর শহর সিউড়ির ১০ কিলোমিটার পশ্চিমে বীরসিংহপুর গ্রাম। এখন অবশ্য এটা নিতান্ত এক গণ্ডগ্রাম। অতীতের প্রসিদ্ধির চিহ্নমাত্র এখন নেই। গ্রামের পূর্বদিকে জঙ্গলাকীর্ণ উঁচু এক স্তূপকে দেখিয়ে গ্রামবাসীরা বলেন, ওই ওখানে ছিল রাজা বীরসিংহের রাজপ্রাসাদ। রাজা বীরসিংহের রাজপ্রাসাদের কোনো চিহ্ন আজ আর নেই ঠিকই তবে রাজার আরাধ্যা দেবী কালী আজও এক ছোটো মন্দির-গৃহে এই বীরসিংহপুরে বিরাজ করছেন।

রাজা বীরসিংহ তাঁর আরাধ্যাদেবীর কৃপা পেয়েছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন কালীভক্ত। বীরসিংহপুরে তিনি পাষাণময়ী দক্ষিণাকালিকার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকের অনুমান, রাজা

বীরসিংহ মহাভারতের জরাসন্ধ ও তাঁর পুরোহিতের বংশধর। তিনি খুব শক্তিশালী ছিলেন। লোকের মুখে মুখে আজও বীরসিংহের বীরত্বের কাহিনি শোনা যায়। শোনা যায়, রাজা প্রতিদিন সকালে দ্রুতগামী ঘোড়ায় চেপে বীরসিংহপুর থেকে কাটোয়ায় গিয়ে গঙ্গাস্নান ও পুজো আহ্নিক করে ফিরে আসতেন। তিনি এত বলশালী ছিলেন, স্নানের সময় তৈল মর্দনের জন্য দু'হাতে সরষে পিষে তেল বের করে গায়ে মাখতেন। স্নান করে রাজধানীতে ফেরার সময় তিনি পথে নায়োডিহিতে বিশ্রাম নিতেন। আজও লোকে সেজন্য নায়োডিহির একটা উঁচু জায়গাকে রাজা বীরসিংহের বিশ্রামপীঠ বলে।

লোককথা আছে, তাঁর নামেই জনপদের নাম বীরভূম হয়েছিল। এই জনশ্রুতি 'বীরভূম' নাম হওয়া সম্পর্কে অনেক প্রবাদের মধ্যে একটা। বীরসিংহের বিশ্বাস ছিল, দেবী কালীর কৃপাতেই তিনি রাজ্যলাভ করেছেন। তিনি প্রতিদিন তাঁর প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরে গিয়ে দেবীর চরণে ফুল দিয়ে পুজো করতেন। দেবীর মন্দির তখন রাজপ্রাসাদের সামনে ছিল। রাজা বীরসিংহ সবসময় দেবীকে সামনে রেখে দিন কাটাতেন। দেবীর আশীর্বাদ ও করুণায় বীরসিংহের রাজত্ব বিঘ্নহীনভাবে চলছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই নানা বিঘ্ন হতে থাকল। রাজ্যে শান্তি নষ্ট হতে লাগল।

বীরসিংহপুরের তখন রমরমা অবস্থা — রাজ্যের অধিবাসীদের মনে সুখ, প্রাণে আনন্দ। এমন সময় দেশে হানাদার এল। তখন বাংলার সুবাদার ছিলেন গিয়াসুদ্দিন। তিনি ছিলেন পররাজ্যলোভী অত্যাচারী ও খল। গিয়াসুদ্দিন যখন রাজা বীরসিংহকে নিজের বশ্যতা স্বীকার করাতে পারলেন না, তখন রেগে গিয়ে ১২২৬ সালে প্রচুর সৈন্য নিয়ে বীরসিংহপুর আক্রমণ করলেন। সুবাদার গিয়াসুদ্দিনের বিরুদ্ধে তিন রাজা তথা তিন ভাই একসঙ্গে রুখে দাঁড়ালেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল দুর্জয় আদিবাসী সেনা। সেদিন স্বদেশ রক্ষার জন্য বীরভূমের বীররা প্রাণপণে লড়েন। যুদ্ধে হেরে পালান সুবাদার গিয়াসুদ্দিন। অনেক ইসলামি সৈন্য লড়াইয়ে মারা যান। যুদ্ধে জিতলেও বীরসিংহপুরের আকাশের কালো মেঘ কাটল না। কুচক্রী লোভী গিয়াসুদ্দিন ফের সৈন্য জোগাড় করে বীরসিংহপুরে ফিরে এলেন। সীমান্তের কাছে তাঁর ছাউনি পড়ল। এবার আর শক্তির পরীক্ষা নয়, গিয়াসুদ্দিন কূটবুদ্ধির খেলা খেললেন। তিনি বীরসিংহের সব থেকে ছোটো ভাই ফতেসিংহকে ঘুষ ও নানান লোভ দেখিয়ে বশ করলেন। শুধু বীরসিংহপুরের সিংহাসন নয় আরো অনেক জায়গীর দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ফতেসিংহকে হাত করা হল।

বিশ্বাসঘাতক ফতেসিংহের কু-পরামর্শ মতো

নিজেদের সৈন্যবাহিনীর সামনে একপাল গাভী রেখে গভীর রাতে গিয়াসুদ্দিন দ্বিতীয়বার বীরসিংহপুর আক্রমণ করলেন। আল্লাহু-আকবর, আল্লাহু-আকবর ধ্বনি দিতে দিতে যবন সেনা এগোতে থাকল। ধর্মপরায়ণ রাজা বীরসিংহ হঠাৎ এই আক্রমণ আটকাতে এসে দেখলেন, কুচক্রী কাপুরুষ ইসলামি সুবাদারের হীন চক্রান্ত ও প্রিয় ভাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতা। যুদ্ধ করতে গেলে অনেক গো-হত্যা হবে আর গো-হত্যা মহাপাপ। সেজন্য মনে মনে ইষ্টদেবী কালীকে স্মরণ করে বীর রাজা বীরসিংহ যুদ্ধ থেকে বিরত হলেন ও অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে শত্রুসেনার হাতে প্রাণ দিলেন। বীরসিংহপুর যবনের আয়ত্বে চলে গেল। রাজাকে কাপুরুষের মতো খুন করে, রাজপ্রসাদ ধ্বংস করে রানিমহল দখল করতে ছুটে এলেন ইসলামি সেনারা।

রানি খবর আগেই পেয়েছিলেন। তিনি ও অন্যান্য মেয়েরা রাজবাড়ির লাগোয়া কালীদিঘিতে ডুবে প্রাণ দিলেন। সেদিন থেকে কালীদিঘির নাম হল রানিদহ বা রানির বাঁধ। দেবী কালিকার নামেই দিঘির নাম ছিল কালীদিঘি। এইভাবে বুঝি জগজ্জননীর ইচ্ছাতেই ভক্ত রাজা বীরসিংহের পতন হল। এখনো বীরসিংহপুরে 'মগধেশ্বরী' কালী নামে তিনি অধিষ্ঠিতা রয়েছেন। যাই হোক, বীরসিংহপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীও সেই যবনদের অঞ্চলে আর থাকলেন না। বীরসিংহপুরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রাজা বীরসিংহের ছেলে বীররাজ রাজ্য ছেড়ে পালান। তিনি কুলদেবী কালিকাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। আবার দেবীর কৃপা হল। ১২২৭ সালে গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর পর বীররাজ বাবার রাজ্য উদ্ধার করতে না পারলেও বীরসিংহপুরের কিছুদূরে রাজনগরে রাজ্য পত্তন করলেন। সিউড়ি থেকে ২২/২৩ কিলোমিটার পশ্চিমে আজও রাজনগর বা নগরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সম্ভবত প্রাচীন গ্রাম বীরনগরকেই লোকে রাজনগর বা নগর বলত। কালীভক্ত রাজা বীরসিংহনগরের কালীদহে এক বড়ো দিঘি খুঁড়ে তার পাড়ে একটা মন্দির গড়ে কুলদেবীকে ফের প্রতিষ্ঠিত করেন। দেবীর প্রতিষ্ঠার পর আস্তে আস্তে রাজা বীররাজের উন্নতি হতে থাকে ও তিনি তাঁর রাজ্য সুদৃঢ় ও বিস্তৃত করেন। সেসময় রাজনগর এক প্রসিদ্ধ জনপদ হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করে। বীররাজের উত্তরপুরুষরা ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত নগরে রাজত্ব করেন।

এই নগরও পরে ইসলামিদের দখলে আসে প্রায় ১৬০০ সালে—বীররাজ বংশের তখন পতন হয়েছে। কিংবদন্তি, বীরনগর অর্থাৎ নগরের এক পুকুর থেকেই পরে দেবীকে পাওয়া গিয়েছিল। শোনা যায়, গ্রামের বাসিন্দারা হঠাৎ একদিন দেখতে পেল দেবীর একটা হাত ও মাথা জলাশয়ের জল থেকে উঠে আছে। তাই দেখে চারদিকে শোরগোল পড়ে গেল। নগর সেইসময় ইসলামিদের দখলে ছিল। হিন্দু বাসিন্দারা দেবীকে জল থেকে তুললেও দেবী সেখানে থাকলেন না।

শোনা যায়, একদিন এক ইসলামি তাঁর গোরু কাটা রক্তমাখা ছুরিটা যখন সেই পুকুরে ধুচ্ছিলেন তখন দেবী সেই নোংরা জল ত্যাগ করার বাসনা করলেন। প্রবল বন্যা হল, তাতে পুকুরের পাড় ভেঙে বন্যার জল ঘুসকর্ণি নদীতে এসে পড়ল। বন্যার জলে ভাসতে ভাসতে দেবী ফের বীরসিংহপুরে এলেন। তখন সম্ভবত বীরসিংহপুরবাসী দেবীকে বীরসিংহপুরে ফের প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই থেকে বীরসিংহপুরেই অধিষ্ঠিত হয়ে রাজা বীরসিংহের ইষ্টদেবী পুজো পেয়ে আসছেন।

পারদিহ কালী মন্দির

গৌরবন্ধু গুপ্ত

পারদিহ কালী মন্দির। ন্যাশনাল হাইওয়ের ওপর। রাঁচির থেকে জামশেদপুর ঢোকার মুখে এই মন্দির অবস্থিত। এই প্রাচীন মন্দির প্রায় ৩০০ বছরেরও বেশি পুরোনো। এক নাগা বাবা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এটি দশনামী নানা অন্তাসী আশ্রম শ্রী পঞ্চদশ নাম জুনা আখড়ার শাখা। খুবই জাগ্রত মন্দির। জামশেদপুর থেকে রাঁচি অথবা পুরুলিয়ার দিকে যে গাড়িই যায় তারা সবাই এই স্থানে দাঁড়াবে মাকে প্রণাম করবে তারপর ওই আপে যাবে। নাহলে যাত্রা শুভ হবে না এটাই প্রায় লোকের বিশ্বাস। আমার সাথেও এরকম কিছু ঘটনা ঘটেছে যা আমার চিরকাল মনে থাকবে। তখন আমি দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ি। আমাদের কিছু বন্ধুদের কাছে তখন বাইক হয় আমরা ৮ জন বন্ধু ঠিক করলাম রাঁচির দশমফলস দেখতে যাব। জামশেদপুর থেকে প্রায় ১৪০ কি.মি. সবাই প্রায় সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ বাড়ি থেকে বেরোলাম। আমার বন্ধু রবি, সোনু, শঙ্কর, প্রবির, অভিজিৎ, শিবাশিস, সঞ্জিব ও আমি। আমাদের সাকচির বাড়ি থেকে যাত্রা শুরু হল। সবাই সেই মন্দিরে পৌঁছোলাম। আমরা সবাই, রবি ও সোনু বাদে মন্দিরে গেলাম, প্রণাম করলাম। তারপর যাত্রা শুরু হল। রবি ও সোনু এক স্কুটারে ছিল। খুব মজা করতে করতে যাচ্ছি। হঠাৎ আমাদের মধ্যে গাড়ির রেস লাগে। কে তাড়াতাড়ি পৌঁছোতে পারে। সবাই যাচ্ছি যাচ্ছি। রবি আর সোনু খুব স্পিডে আগে বেরিয়ে যায়। আমি আর অভিজিৎ এক বাইকে ছিলাম। আর আমরা সব থেকে পেছনে ছিলাম। আমরা কোনো প্রতিযোগিতাতে ছিলাম না। সবাই আমরা প্রায় ১১টা নাগাদ দশমফল পৌঁছে গেছি। কিন্তু দেখি রবি আর সোনু নেই। কেউ ওদের রাস্তাতেও দেখেনি। আমরা ঘুরলাম দশম ফলস। একটা ধাবাতে বসে দুপুরের খাবার খেলাম। কিন্তু মাথায় ওদের নিয়ে চিন্তা ছিল। তারপর ধীরে ধীরে ফিরতে শুরু করলাম। অনেকটা রাস্তা যেতে হবে আর ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাওয়ার ভয় ছিল। কারণ বাড়িতে বলেছিল সন্ধের আগে ফিরবি। আমরা পুরো রাস্তা ওদের দেখতে দেখতে এলাম কিন্তু কোথাও পেলাম না ওদের। এবার সবাই আমার বাড়িতে জড়ো হলাম। শুধু রবি আর সোনু বাদে। সবাই ধীরে ধীরে খুব ভয় খেতে শুরু করছি যে কি হল ওদের? কোথায় গেল? রবির বাবাকে সবাই খুব ভয় করে। কিন্তু কাকু খুবই ভালো ছিলেন। আমাকে খুব ভালোবাসতেন। কাকু ছিলেন কালী ভক্ত। মা কালীর ওপর ওনার খুব বিশ্বাস ছিল। আমরা ৬ জন ঠিক করলাম, একবার চল রবির বাড়ি যাই। দেখি কোথাও ফিরে তো আসেনি, এই ভেবে সবাই রবির বাড়ি গেলাম। ওর বাড়ির লে দাঁড়িয়ে সবাই। কিন্তু কারোর ভেতরে ঢোকার সাহস নেই। সবাই বলল, আমাকে তুই যা আগে। আমরা পেছনে পেছনে যাব। আমরা সবাই কাকুকে খুব ভয় করতাম। কোনো রকম ভয়ে ভয়ে গেলাম। সামনের ঘরে ঢুকতেই দেখি রবি চেয়ার এ বসে আছে। রবির বাবা মা বোন সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে নিস্তব্ধ ভাবে আমিও ওদের দেখে চুল, মাথা ঘোরালাম। আমি দেখি আমার পাশে শুধু প্রবীর আছে আর কেউ নেই। ভয়ে কোনো বন্ধু আর বাড়িতে ঢোকেনি। দেখি রবির মাথায় হাত, পা, ঘাড় দারুনভাবে চোট পেয়েছে। ওদের নাড়িকে আমার (একটা জায়গার নাম) এর কাছে একটা ট্রাক দেখে ভয়ে রাস্তা থেকে নেমে ক্ষেত-এ গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে খুব চোট লেগেছে। দুজন এরই গাড়ি প্রায় পুরো দুমড়ে গেছে। খুব ভালো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রবির বাবা আমাকে ও সবাইকে ডাকলেন। বললেন, বস, আমি এখন খুবই ভিত, ভাবলাম খুব বকা খাব কিন্তু কাকু খুব ঠান্ডা। বললেন, জল খা, জল খেলাম। কাকু জিজ্ঞেস করলেন, সকাল থেকে কি হয়েছে বলত? আমি সব খুলে বলতে শুরু করলাম। কিছু লুকোলাম না। কাকু সবকিছু ঠান্ডা মাথায় শুনলেন। তারপর বললেন, তোদের কোনো ভুল নেই, তোদের কোনো দোষ নেই। ভুলটা জানিস কোথায় হয়েছে? আমি অবাক হয়ে কাকুর দিকে তাকিয়ে আছি। বললাম না। তখন উনি বললেন এরা যদি মন্দিরে ঢুকতো তাহলে ওদের কিছু হত না। মন্দির খুবই জাগ্রত।

কিরণ বেদীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

কর্পোরেট জগতে কাজের সূত্রে রাজনীতিবিদ থেকে শিল্পপতি নানা ধরনের মানুষের কাছাকাছি এসেছেন কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট **মানসকুমার ঠাকুর**। এই বিভাগে প্রতি সংখ্যায় তিনি একজন মানুষের অজানা কথা তুলে ধরছেন।

২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ। তখন আমি দ্য ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্টস অফ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সভাপতি। পন্ডিচেরির মুখ্যমন্ত্রী এন নারায়ণ স্বামী এক বৈঠকে আমাকে আমন্ত্রণ জানান। ক্ষুদ্র শিল্প ও দক্ষতা উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা ছিল। পন্ডিচেরি পৌঁছোনার পর হঠাৎই সেখানের রাজ্যপালের কথা আমার খেয়াল হয়। ওই সময় পন্ডিচেরির রাজ্যপাল ছিলেন দেশের প্রথম প্রাক্তন মহিলা আই পিএস অফিসার কিরণ বেদি। আচমকা এভাবে একজন হাই প্রোফাইল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ চাওয়াটা আমার নিজেরই মনে হয়েছিল অন্যায়। কিন্তু আমার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের চেষ্টায় খুব অল্প সময়ের জন্য সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়। প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা আমার বেশ মনে আছে। কিরণ বেদি বলেছিলেন, 'ভারতের মতো দেশে প্রকৃত কস্টিং সিস্টেম খুব দরকার। এই ব্যাপারে আপনাদের আরো বেশি আক্রমণাত্মক হতে হবে'। উনি প্রশ্ন করেছিলেন, কস্ট অডিট কোন কোন ক্ষেত্রে হয়? আমার উত্তর শোনার পর তিনি বলেন, সব তালিকাভুক্ত কোম্পানি, স্বাস্থ্য দফতর, শিক্ষা দফতর ও খাদ্য দফতর অবশ্যই কস্ট অডিটের আওতায় আসা উচিত। ওনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর আমার মনে হয়েছিল পেশাদারিত্ব ও পেশা এই দুটো বিষয়ই উনি খুব ভালো বোঝেন। এরপর কিরণ বেদির সঙ্গে অনেকবারই দেখা হয়েছিল। কখনো বিমানবন্দরে, কখনো এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে, আবার কখনো বিমানের মধ্যেই। একটা ঘটনা মনে পড়ছে যেটা না বললেই নয়। একবার আমি বিমানের বিজনেস ক্লাসের আসনে বসে রয়েছি। আচমকা মুখ তুলে দেখি দেহরক্ষী নিয়ে কিরণ বেদি আমাকে পেরিয়ে গিয়ে একজিকিউটিভ ক্লাসের আসনে গিয়ে বসলেন। আমি দেখে সত্যিই বিস্মিত হলাম। আসন থেকে উঠে ওনার কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম, 'আপনি এখানে কেন'? উনি হেসে উত্তর দিলেন, 'যেখানেই বসি আপনার আগে নামব ও একই সময়ে দিল্লি পৌঁছোব'। আমার জীবনে আগে কোনোদিন এই রকম বিশেষ ব্যক্তিত্বের মানুষ দেখিনি। যিনি অসম্ভব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়েও বিমানের সাধারণ শ্রেণিতে

যাতায়াত করা পছন্দ করেন। এটা সত্যিই আমার জীবনের এক বড়ো শিক্ষা। এরপর আর একবার সাক্ষাৎকারে কিরণ বেদি আমাকে বলেছিলেন, 'আর্থিক স্বনির্ভরতা না থাকলে প্রকৃত ক্ষমতায়ন আসবে না। উপার্জন ও সঞ্চয়ই একজনকে স্বনির্ভর করতে পারে'।

দেশের প্রথম প্রাক্তন মহিলা আইপিএস অফিসার কিরণ বেদি তাঁর কাজের জন্য ২০০৩ সালে 'ইউনাইটেড নেশন' মেডেল পান। প্রথম ভারতীয় ও মহিলা আইপিএস হিসাবে ইউনাইটেড নেশন সিভিল পুলিশ অ্যাডভাইজার পদ পান। 'রামন ম্যাগসেসে' পুরস্কারও তাঁর জীবনের বড়ো প্রাপ্তি। দেশের কারাগার সংস্কারের বিষয়টি তাঁরই মস্তিস্কপ্রসূত। এমন অনন্য ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে আমাদের অনেক সামাজিক শিক্ষা নেওয়া রয়েছে।

হই যদি মন্দ মেয়ে

তানিয়া

মন্দ হতে আমিও পারি,
অল্পে কিস্তিমাত-
কাজল আঁকা চোখের কোলে
অহংকারী রাত।
নকল খোঁপায় কাঁটার খোঁচা,
কৃত্রিম গোলাপ-
মুখোশ টানা সুখের সাথে,
বিস্তর আলাপ।
রঙিন ঠোঁটের মেকি হাসি-
হৃদয়ে মন্দবাসা
ঔদ্ধত্যের চাবুক হাতে,
উপেক্ষারই ভাষা।
বুকের মাঝে বারুদ ঠাসা-
সাধ্য কি তোর ছুঁবি!
মন্দ মেয়ের উপাখ্যানে,
প্রেমের ভরাডুবি।

বিশ্বাস

ক্ষিতীশ বর্মণ

নিরজনে আজি বাজিল প্রাণে
তব মধু প্রেমগীতি,
হে মোর প্রিয়া আজও অমলিন
সে ঘোরময় স্মৃতি।
প্রথম দিনের তব পুলক দৃষ্টিবাণ
বধিয়াছিল মোরে,
বেণী ফুলমঞ্জরীর স্নিগ্ধ গন্ধ
দিয়েছিল উচ্ছুল করে।
বাঁধিয়াছি মোরা অতি যতনে
এই ছোট্ট নীড়,
বহে যেন সদা দেহ মনে
বিশ্বাস শান্তি নিবিড়।

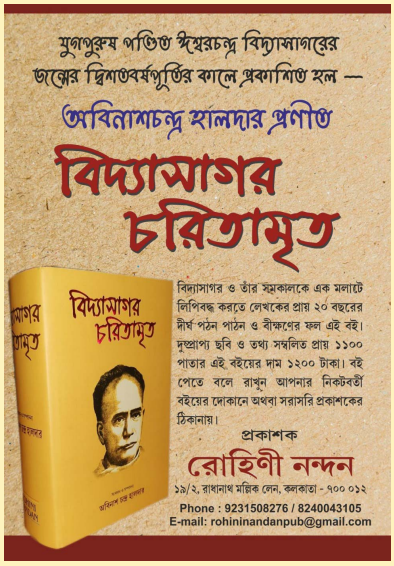

ছবিঘর

শঙ্কর ঘোষ

এই মহানগরীতে নিভে গেল আরেকটি প্রদীপ
মহানগরীর উত্তর মধ্য দক্ষিণে কতগুলির ঝাঁপ বন্ধ হল?
এ সময়ে তার খতিয়ান কেই বা রেখেছে?
এক একটি ছবিঘরে কত ছবিই না দেখেছি
হেসেছি কেঁদেছি বাহবা দিয়েছি মনের মত সংলাপে,
সে সব মনে হয় গত জন্মের কথা।
বন্ধ হওয়া ছবিঘরগুলি এখন এক এক রকম চেহারায়,
ঝাঁ চকচকে বাজার নিয়েছে যার সিংহভাগ।
কারও স্থানে উঠেছে আকাশ ছোঁয়া আবাসন।
অন্যগুলির পলেস্তারা খসে খসে পড়ছে,
কার কি এসে গেল, আরেকটা প্রদীপ যদি নিভেই গেল!
প্রদীপের নিচেই থাকে অন্ধকার, তাই দেখি ফি বছরের
একাদশ মাসে ফিল্মোৎসবের বিশাল আয়োজন,
দেশি বিদেশি কত চেনা জানা অচেনা লোকের সমাগম।
কত জৌলুস, বিশাল অঙ্কের সব পুরস্কার
দিন দশেকের এই পার্বণ শেষে প্রাপ্তি কি হয় কে জানে?
শুধু ভাবি অগুনতি সাধারণ দর্শকের ওই অবশিষ্ট
ছবিঘরগুলি বাঁচানোর কোন তাগিদ আছে কি কারও?
এও জানি সময়ের প্রলেপ এসে পড়বে বিক্ষুব্ধ মনে,
শুধু দু'ফোঁটা জল থেকে যাবে চোখের কোণে।

সাধনতত্ত্ব

তনুশ্রী চক্রবর্তী

পঞ্চভূতের সাধন তত্ত্ব পঞ্চলাভ-কালে
পঞ্চমুখী একনামের ছবিই এঁকে চলে
পঞ্চসুরে গাইছে ভোলা পঞ্চমে হয় স্থির
পঞ্চাননের রূপ হল আচানক স্থবির।।
সপ্তচক্র সপ্তসাগর সপ্তমে শেষবার
সপ্ত দিনের শেষে জানায় অজানা বাহার
সপ্ত ভাগে ভাগ হল যে স্বপ্ন স্বর্গ নরক
সপ্ত নামে সুপ্রসন্ন চেতনার সড়ক।
নয় দুয়ারী দিচ্ছে হানা নবমে দেয় দোল
নয়ের ঘোরে আছি মোরা নয়ের সর্বকোল
নয়ের রঙে মেতেছে আজ নয়ের খেলা যে!
নবমী তিথি ডেকে বলে-বিধান নব সাজে।।
একাদশী জোয়ার আজি সুরের দুটি কুল
একটি একা একটি বাঁকা সবই গোকুল।
সকল ছন্দে উঠেছে মেতে সকল ভোলা যে
নবরসে ন'গুণে জাগাও সবে, জাগো নিজে।

বিশেষ রচনা

গ্রামাঞ্চলে বুনিয়াদি শিক্ষা সঙ্কটের মুখে

অর্পণ পাল, শিক্ষক

করোনার জেরে জীবনযাপনে অস্বাভাবিক ধরনের বদল এসেছে। আমরা মুখ মাস্কে ঢাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। কিন্তু করোনার আবহে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বুনিয়াদি শিক্ষা।

করোনা-পূর্ব জীবনে স্কুলশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রামের গরিব, প্রান্তিক ছেলেমেয়েদের স্কুলে টেনে আনার জন্য কিছু টোপের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। যার ফল মিলেছিল হাতেনাতে। বিদ্যার সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন লোকেরাও তাঁদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতেন ওইরকম বস্তুগত কিছু লাভের উদ্দেশ্যে। এতে লেখাপড়া বা বিদ্যালাভ খুব ভালো না হলেও কিছু ক্ষেত্রে অন্তত স্কুলের পরিকাঠামো বা শিক্ষকদের সদিচ্ছার জোরে ছেলেমেয়েরা অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে উঠছিল। কিন্তু করোনা আবহে স্কুল বন্ধ থাকার ফলে সেই রকম পরিবারের সন্তানরা বাধ্য হয়েই স্কুলছুট হয়ে পড়ল। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল না থাকার জন্য বা অন্য নানা কারণে তাদের অভিভাবকরাও বাধ্য হলেন ছেলেমেয়েদের রোজগারের খোঁজে অন্য জায়গায় পাঠাতে। মেয়েদের ক্ষেত্রে সরকারি প্রকল্প কন্যাশ্রী'র নামে আর্থিক সাহায্য এখনো বন্ধ না হলেও কোনো কারণে গ্রামাঞ্চলে প্রচুর মেয়ের এরমধ্যে বিয়েতে বাঁধা পড়েছে। ঠিক কত মেয়ে গত ২ বছরে স্কুলের খাতা থেকে নাম কাটাতে বাধ্য হল, সে পরিসংখ্যান আগামী দিনে মিলবে আশা করি। আর যারা তবু রয়ে গেল স্কুল ছাত্র হিসাবে? হ্যাঁ, তাদের নিয়ে চিন্তা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বইকি। প্রথমত, দীর্ঘদিন বিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারণে এরা প্রচলিত শিক্ষালাভের বারিধারা থেকে বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত, অনলাইন ক্লাস নামে বিষয়ের সঙ্গে অধিকাংশ গ্রামীণ ছাত্রছাত্রী সড়গড় নয় বা ইচ্ছে থাকলেও বেশ কিছু কারণে সেই গতিধারার সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পারছে না। ইন্টারনেট পরিষেবার অপ্রাচুর্য, স্মার্টফোনের অভাব প্রভৃতি কারণে গ্রাম্য ছেলেমেয়েরা সে ধরনের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেল। আর সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার, সরকারি স্তরে পরিকল্পিত শিক্ষা দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় অনলাইন ক্লাস ব্যাপারটাই স্থানীয় উদ্যোগের স্তরেই এখনো পর্যন্ত রয়ে গেছে।

কিন্তু সেই শিক্ষার প্রায় পুরোটাই নিতে পেরেছে কিংবা পারছে আপাত-শহুরে এলাকার বেসরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। বিদ্যালয়কেন্দ্রিক নির্দিষ্ট পরিকাঠামো থাকায় ওই সব স্কুলের শিক্ষকরা করোনা আবহের প্রায় পুরো সময়েই ছেলেমেয়েদের পড়ানোর কাজে লেগে থাকতে পেরেছেন। সরকারি ও বেসরকারি স্তরের ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালাভে এই বড়ো আকারের ফারাকটা গড়ে উঠেছে গত দেড় বছরে।

গত দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে সরকারি স্কুলের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সঙ্গে প্রায় সম্পর্ক না থাকাটা আগামী দিনে একটা পুরো প্রজন্মকে শিক্ষাবিমুখ করে তোলার ব্যাপারে কার্যকরী ভূমিকা নেবে। আর সেটাই সবচেয়ে চিন্তার ব্যাপার। পুজোর সময়ে কিছু মানুষের অপরিণামদর্শিতার কারণে করোনার নতুন করে সংক্রমণ ফের আমাদের মনে এই প্রশ্ন তুলছে, সত্যিই কি অদূর ভবিষ্যতে স্কুল খোলার মতো পরিস্থিতি আর আসবে, নাকি ধুলোমাখা সব বেঞ্চিতে ধুলোর স্তর আরও পুরু হয়ে উঠবে?

১৫ বছর বয়সেই সফল উদ্যোগী ধ্রুবজ্যোতি স্বপ্নকে ছুঁয়েছে

ভাস্কর রায়

মাত্র ১৫ বছর বয়স। এই বয়সেই ধ্রুবজ্যোতি দাস একজন সফল উদ্যোক্তা। ব্যবসায়িক পরামর্শদাতা, বিক্রয় ও বিপণন উপদেষ্টার খ্যাতিও এই কিশোর বয়সেই সে অর্জন করেছে। ধ্রুবজ্যোতি একজন ব্লগার ও ফ্রিল্যান্সার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছে ইকোনোস্টিক্স (ওপিসি) প্রাইভেট লিমিটেড নামে এক সংস্থা। এই সংস্থা দেশ জুড়ে উদ্যোগীদের ব্যবসা করার জন্য পরামর্শ দেয়। প্যান ইন্ডিয়ার ব্যবসার জন্য নিখরচায়ও প্রাথমিক সমাধান করে। ধ্রুবজ্যোতির ইকোনোস্টিক্স শিল্প বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে যথাযথ ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, বিপণন ও বিক্রির কৌশল জেনে নেয়। এরপর দেশের ছোটো ছোটো ইউনিট আর সব স্টার্টআপকে বাড়াতে সাহায্য করে। অনেক সংস্থারই তাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে সিআরএম, কর্মচারী ও অন্যান্য ব্যবসায়িক কাজ পরিচালনার জন্য নির্দেশিকার দরকার হয়। ইকোনোস্টিক্স তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়। এখানে নামমাত্র খরচে বা অনেকসময় নিখরচাতেও পরামর্শ দেওয়া হয়।

ধ্রুবজ্যোতি দাস মাত্র ১২ বয়সে একজন ব্লগার হিসাবে কেরিয়ার শুরু করে। ১৩ বছর বয়সে মার্কেটিং ও সেলস উপদেষ্টা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। কোভিড পরিস্থিতিতে সে শিল্প সম্পর্কে অনেক পড়াশোনা ও পর্যবেক্ষণ করে নিজস্ব উদ্যোগে চালু করে ইকোনোস্টিক্স। ব্যবসা শুরুর সময় অবশ্য তাকে অনেক সমস্যারই মুখোমুখি হতে হয়, এমনকী নিজের পরিবারও পাশে ছিল না। পরে তার কাজ দেখে পরিবার ও অন্যরা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। উদ্যোক্তাদের সাফল্যের কাহিনি ধ্রুবজ্যোতিকে অনুপ্রাণিত করে। এখন পর্যন্ত ইকোনোস্টিক্স দেশের কয়েকশো সংস্থাকে ব্যবসায়িক পরামর্শ দিয়ে সফল ব্যবসা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। উদ্যোগী ধ্রুবজ্যোতি জানিয়েছে, ক্ষুদ্র শিল্পই দেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তার এই সংস্থা ছোটো ব্যবসা ও স্টার্টআপের জন্য কিছু সহায়ক ও ভালো প্যাকেজ তৈরি করবে। এই প্যাকেজ চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার বাজারে নতুনদের নয়া পথ দেখাবে, একইসঙ্গে বাজারে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করবে।

মোমের আলোই নয়া পথের দিশারী

এই বিভাগে তুলে ধরা হবে কীভাবে হাতের কাজের মাধ্যমে দরকারি ও শৌখিন সামগ্রী তৈরি করে রোজগারের উপায় বের করা যায়। প্রথম সংখ্যায় মহারাজা কর্ণধারের চিরঞ্জয় চক্রবর্তী জানাচ্ছেন প্লাস্টিকের পাত্রে মোমবাতি তৈরির উপায়।

প্লাস্টিকের পাত্রে মোমবাতি তৈরি

আমরা কোনো কাজের বাড়িতে যেসব প্লাস্টিকের কাপে চা, কফি বা শরবত খাই তার মধ্যেই মোমবাতি তৈরি করা যেতে পারে। বিদেশে এই রকম ডাইস পাওয়া যায়, ইংরেজিতে বলে ভোটিভ। আমাদের এখানে পাওয়া যায় না বলে আমরা হাতের কাছে যা পাই তাই দিয়ে মোমবাতি বানানোর চেষ্টা করি। ফ্রিজে বরফ রাখার ট্রে সব বাড়িতে পাওয়া যায়। নানা আকৃতির প্লাস্টিকের পাত্র পাওয়া যায়, যা আপনার পছন্দ তাতেই মোমবাতি বানানো যায়।

যে সব উপকরণ লাগবে

বরফের ট্রে, ২ ইঞ্চি করে লম্বা দশটা সলতে, দশটা সলতের নীচের ধারক, ওপরে দুই লাইনের জন্য ২টি ধারক, প্যারাফিন ২০০ গ্রাম, স্টিয়ারিক অ্যাসিড ২০ গ্রাম ও রং (যদি আপনি ব্যবহার করতে চান)।

কীভাবে তৈরি করতে হবে

(১) বরফের ট্রে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। এরপর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে ব্রাশ দিয়ে পাতলা করে এতে তেল মাখিয়ে নিতে হবে।

(২) ১০টা সলতেকেই তরল প্যারাফিনে চুবিয়ে কাঁচের প্লেটের ওপর টানটান করে রেখে দিতে হবে, যাতে সলতেগুলো শক্ত কাঠির মতো হয়ে যায়। সলতেগুলোর তলায় প্লাস দিয়ে নীচের ধারক লাগিয়ে নিতে হবে।

(৩) আঠা দিয়ে সলতে সহ ধারকগুলো ঠিক তলদেশের মাঝখানে লাগিয়ে দিতে হবে। ওপরের ধারক দুটো লাগিয়ে সলতেগুলো টানটান করে দিতে হবে।

(৪) প্যারাফিন যে পাত্রে গলছে, থার্মোমিটার দিয়ে তরল প্যারাফিনের তাপমাত্রা দেখে নিতে হবে। এই তাপমাত্রা যেন ৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস

বা ১৭৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি না হয়।

(৫) রং মেশানোর ইচ্ছা থাকলে যে কোনো রং অল্প পরিমাণে তরল প্যারাফিনে মিশিয়ে নিতে পারেন। এতে মোমবাতিগুলো রঙিন হবে। আরেকটি পদ্ধতিতে রং করা যেতে পারে।

(৬) তরল প্যারাফিন বরফের ট্রে'র প্রতিটি খোপে ঢেলে দিতে হবে। একবার ঢাললে হবে না, কয়েকবার না ঢাললে মোমবাতির ওপরের তল সমান হবে না। তাই বারবার ঢেলে সমান করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, আগের ঢালা তরল মোম শক্ত হওয়ার আগেই আবার তরল ঢালতে হবে। যাতে ওপরের দিক সমান হয়।

(৭) মোম ঠান্ডা ও শক্ত হওয়ার জন্য সময় দিতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে সলতে ধরে টানলে মোমবাতি উঠে আসবে।

(৮) ছুরি দিয়ে ওপরের সব ধার কেটে নিতে হবে ও সলতেগুলো কেটে ছোটো করে দিলেই মোমবাতি ব্যবহারের মতো হয়ে যাবে।

(৯) এই মোমবাতিগুলো যে কোনো জায়গায় বসানো যায়, একটা থালায় নিয়ে আরতি করা যায়। মন্দিরে পুজো দেওয়া যায়। এছাড়া বাজারে বিক্রিও করা যায়। পাইকারি বাজার কলকাতার বড়বাজার। মোমবাতি তৈরির যাবতীয় উপকরণ এখানে পাওয়া যাবে।

ধনতেরাস আয়ুর্বেদ ওষুধ কেনার দিন

ধন্বন্তরী নামে কাশীতে এক রাজা ছিলেন। তিনি তাঁর রাজত্বের বাইরে গিয়েও আয়ুর্বেদ প্রচার করেন। তার প্রচারেই আয়ুর্বেদ আমাদের দেশে এতো প্রসিদ্ধ। তাই আয়ুর্বেদ ও মহৌষধের কথা উঠলেই বলা হয় ধন্বন্তরীর নাম। তিনি ত্রয়োদশী তিথিতে জন্ম নেন। তাই তখন থেকেই আয়ুর্বেদ প্রেমিকরা তাঁর জন্ম তিথি ধন্বন্তরী ত্রয়োদশী হিসাবে পালন করে। হিন্দিতে এটাকে ধন্বন্তরী তেরসা বা সংক্ষেপে ধনতেরাস বলে। এর সঙ্গে ধন বা অর্থের কোনো সম্পর্ক নেই।আমরা এতটাই মূর্খ। আর ব্যবসায়ীরা আমাদের এই মূর্খামিকেই মূলধন করে ব্যবসা করছে। ধনতেরস সোনার গয়না নয়, আয়ুর্বেদ ওষুধ কেনার দিন।

ধন্বন্তরী জন্মেছিলেন ত্রয়োদশী তিথির শেষ লগ্নে। চতুর্দশীর শুরুতে। তাই ধন্বন্তরীর মতো আয়র্বেদাচার্য কে মর্যাদা দিয়ে চতুর্দশী তিথিতে বিশেষ চোদ্দটি পুষ্টি গুণযুক্ত শাক খেয়ে আপনার শরীরে এই শীতের শুরুতে প্রাকৃতিক ভ্যাক্সিন প্রবেশ করান।

চরিত্রের বয়স অনুযায়ী নিজের গলাকে ব্যবহার করি : ঊর্মিমালা বসু

প্রায় চার দশক ধরে বেতার নাটক ও শ্রুতি নাটক জগতের কিংবদন্তি নাম ঊর্মিমালা বসু। তাঁর কণ্ঠের জাদুতে আজও দর্শকরা মুগ্ধ। সত্তরোর্দ্ধ বয়সে এসেও তিনি সদ্য যৌবনে পা রাখা তরুণীর গলায় অভিনয় করে তাক লাগিয়ে দেন। সেই ভার্সেটাইল ঊর্মিমালা বসু নিজের কর্মজীবনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন, জীবনসঙ্গী নিয়ে অকপট।

প্রশ্ন : আপনি কীভাবে বেতার জগতে আসেন?

ঊর্মিমালা বসু : ষাটের জগতে বেতার জগতে আসি। স্কুলের নীচু ক্লাসে পড়তে পড়তে সংস্কৃতে নাটক করতাম। একাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময় কালিদাসের নাটক করি। তখন পেয়েছিলাম ড. রমা চৌধুরী ও বিমল চৌধুরীর মতো মানুষকে। এরপর যুববাণী-তে অনুষ্ঠান করি। ১৯৮২ সালে অডিশন দিয়ে আকাশবাণীর নাটক বিভাগে নথিভুক্ত শিল্পী হয়েছিলাম। 'বিবিধ ভারতীর' সুচিত্রা'র সংসার ও বোরোলীনের সংসার-য়ের মাধ্যমে সবার কাছে পরিচিত হয়ে উঠি। আকাশবাণীর নাটকের ক্ষেত্রে যেমন শিল্পীদের নাম বলা হতো বিবিধ ভারতীর ক্ষেত্রে তেমনটা হতো না। তা সত্ত্বেও শ্রোতারা ঊর্মিমালা বসুকে আলাদাভাবে চিনে নেন।

প্রশ্ন : ওই সময়ে কোন কোন দিকপালদের সান্নিধ্যে আসেন?

ঊর্মিমালা বসু : কাকে ছেড়ে কার কথা বলব! সেটা ছিল বেতারের স্বর্ণযুগ। প্রভাবিত হয়েছিলাম জয়ন্ত চৌধুরী, ইন্দিরাদির কাজে। সান্নিধ্যে এসেছিলাম শ্রাবন্তী মজুমদার, মমতা চট্টোপাধ্যায়, শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম চক্রবর্তী, শ্যামল সেন, বিকাশ রায়, তৃপ্তি মিত্র, সম্ভু মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এঁদের সবার কাছে কিছু না কিছু শিখেছি। একবার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় শুনে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিলাম, তাঁর মৃত্যুর কথা শুনে। ওটা অভিনয় ছিল তা ভুলে গেছিলাম। এতটাই প্রাণবন্ত ছিল সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়।

প্রশ্ন : এখন অডিয়ো বুক খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তার কারণ কী?

ঊর্মিমালা বসু : এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস নেই বা পড়তে চান না। তাঁরা অডিয়ো বুকের মাধ্যমে প্রিয় লেখকের গল্প শুনতে পাচ্ছেন। গল্প শোনার এক অন্য আনন্দ রয়েছে। অডিয়ো বুকের জনপ্রিয়তার পিছনে লকডাউনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দীর্ঘ লকডাউনের জেরে ঘরবন্দি মানুষ বাইরের বিনোদন থেকে বঞ্চিত ছিল। ঘরে বসে তাঁরা গল্প শোনার সুযোগ পাচ্ছেন। তাছাড়া এখন প্রযুক্তি বিনোদনকে নিয়ন্ত্রণ

করে। ব্যবসায়ীরা এটাকে কাজে লাগাচ্ছেন। সে যাই হোক, মানুষ বিনোদনের এক অন্য স্বাদ পাচ্ছেন অডিয়ো বুকের মাধ্যমে।

প্রশ্ন : ডিজিটাল যুগে মানুষের বই পড়ার অভ্যাস কি কমে যাচ্ছে?

উর্মিমালা বসু : কিছুটা হলেও কমেছে। তবে যাঁরা সিরিয়াস পাঠক তাঁরা এখনও বই পড়েন। বই পড়ার মাধ্যমে অন্য জগতের খোঁজ পান। আমি এখনও বই পড়তে ভালোবাসি। নিয়মিত বই পড়ি।

প্রশ্ন : আপনি কি অডিয়ো বুকে গল্প পড়েন?

উর্মিমালা বসু : হ্যাঁ, প্রায় এক বছর ধরে এক সংস্থার অডিয়ো বুক'য়ে (প্রতিলিপি) গল্প পড়ি। তবে কোনো ক্লাসিক বা চেনা গল্প পড়ি না। অচেনা গল্প পড়ি।

প্রশ্ন : শ্রোতাদের কেমন প্রতিক্রিয়া পান?

উর্মিমালা বসু : খুব ভালো সাড়া পাই। এই বয়সে আমার কণ্ঠের এই গ্রহণযোগ্যতায় আত্মবিশ্বাস পাই। নতুন প্রজন্মের ভালোলাগায় আমি খুব খুশি।

প্রশ্ন : রেডিয়ো মির্চি কি প্রথম বাংলায় অডিয়ো বুক নিয়ে আসে?

উর্মিমালা বসু : বাংলার অডিয়ো বুকের ইতিহাস আমার জানা নেই। তাই বলতে পারব না। আরও কিছু সংস্থা এটা শুরু করেছিল তবে তারা সফল হতে পারেনি। রেডিও মির্চির উদ্যোগে অডিয়ো বুক শ্রোতাদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছে।

প্রশ্ন : অডিয়ো বুকের ধারণাটা কী?

উর্মিমালা বসু : অডিয়ো মাধ্যমে গল্প পড়া বা বলাই হল এক কথায় অডিয়ো বুক। গল্প পড়া ও গল্প বলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। গল্প বলার মাধ্যমে শ্রোতাদের সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। এই যেমন আমি কথা বলছি। অন্যদিকে, পড়ার মাধ্যমে সেটা হয় না। তাই মানুষ এত গল্প শুনতে ভালোবাসেন।

প্রশ্ন : এর সঙ্গে বেতার নাটকের কোনো সম্পর্ক রয়েছে?

উর্মিমালা বসু : না, বেতার নাটকে কণ্ঠের মাধ্যমে অভিনয় বা ছবি ফুটিয়ে তুলতে হয়। গলায় থাকতে হয় অভিনয়ের দক্ষতা। অডিয়ো বুকে শুধু গল্প পড়তে হয় লেখক যেভাবে লিখেছেন সেটাই। গল্প বলার ক্ষেত্রেও কণ্ঠের মায়াজাল লাগে যা শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

প্রশ্ন : শ্রুতি নাটক কোন সময়ে জনপ্রিয় হয়?

উর্মিমালা বসু : সত্তরের দশক যদি থার্ড থিয়েটারের হয়ে থাকে তবে আশির দশক শ্রুতি নাটকের। বেতার নাটক ও শ্রুতি নাটকের মূল সাদৃশ্য হল- ২টোয় অঙ্গসঞ্চালন নয়, গলার মধ্য দিয়েই মায়াময় জগতকে তুলে ধরতে হয়। তবে বেতার নাটকে একটু ডালপালা ছড়ানো যায় কিন্তু শ্রুতি নাটকে তুলে ধরতে হয় একেবারে কাহিনির নির্যাস। কারণ, শ্রুতি নাটকের সময়সীমা কম। এই নাটক পরিবেশিত হয় মঞ্চে।

প্রশ্ন : আপনারা শ্রুতি নাটককে এক অন্যমাত্রায় পৌঁছে দিয়েছেন। শ্রুতি নাটকের জগন্নাথ-উর্মিমালা জুটিকে উত্তম-সুচিত্রা জুটি বলা হয়। এটা শুনতে কেমন লাগে?

উর্মিমালা বসু : দর্শকদের বিচারে উত্তম-সুচিত্রা জুটি চিরকালীন জুটি। যা আজও আমাদের চোখে মায়াজাল তৈরি করে। ঠিক তেমনি শ্রোতারাই বলবেন আমাদের জুটি সম্পর্কে। তবে, আমরা চেষ্টা করেছি আমজনতার কাছে শ্রুতি নাটককে পৌঁছে দিতে।

প্রশ্ন : আপনাদের জুটির সাফল্যের রসায়ন কী?

উর্মিমালা বসু : আমার আর জগন্নাথের পারস্পরিক বোঝাপড়া। শুধু রোম্যান্টিক অভিনয় নয়, ঝগড়া করার অভিনয়ের ক্ষেত্রেও আমরা সমান সপ্রতিভ। আমরা জানি কোথায় শুরু করতে হবে ও কোথায় থামতে হবে।

প্রশ্ন : আপনার পছন্দের শ্রুতি নাটক কোনগুলো?

উর্মিমালা বসু : এ ভাবে কী বলা যায়! তবে, খুব ভালো লেগেছে 'রবিবার', 'দূরভাষিণী', 'দম্বল', 'পাকা দেখা', 'বসন্ত গোরি' 'একালের কপালকুণ্ডলা'

প্রভৃতিতে অভিনয় করে। প্রতিটা অডিয়ো হিট।

প্রশ্ন : আপনারা সমসাময়িক লেখকদের গল্প নিয়ে তো কাজ করেছেন?

ঊর্মিমালা বসু : হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের রবিবার যেমন করেছি তেমনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তীর লেখাতেও কাজ করেছি। মনোজ মিত্রের লেখা থেকে শ্রুতি নাটক করেছি। একবার এক প্রতিষ্ঠিত কবি তাঁর লেখা নিয়ে অভিনয়ের কথা বলেন। কিন্তু তিনি লেখা দিতে গড়িমসি করছিলেন। একদিন বলেন, আপনারা তো হাসির লেখা পাঠ করেন। তখন তাঁকে বলি, আপনি বোধহয় আমাদের 'রবিবার' শোনেননি। না শুনে থাকলে সেটা আপনার লজ্জা, আমাদের নয়।

প্রশ্ন : আপনার বেতার নাটক-শ্রুতি নাটক, এমনকী আবৃত্তি সব ক্ষেত্রে কণ্ঠের মায়াজালে সব বয়সের শ্রোতারা মুগ্ধ। আপনি কারোর কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন?

ঊর্মিমালা বসু : না, আমি কারোর কাছে প্রশিক্ষণ নিইনি। জীবন থেকে শিক্ষা নিয়েছি। চরিত্রের বয়স অনুযায়ী গলাকে ব্যবহার করি। একইসঙ্গে যেমন ২৪ বছরের তরুণীর গলা করতে পারি, আবার ৭০ বছরের বৃদ্ধার গলা করতে পারি।

প্রশ্ন : রোম্যান্টিক অভিনয়ে আপনি অনবদ্য। ব্যক্তিজীবনেও কি খুব রোম্যান্টিক?

ঊর্মিমালা বসু : হ্যাঁ, আমি খুব রোম্যান্টিক মনের মানুষ। আসলে রোমান্স শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে হয় তা নয়। প্রকৃতি বা একাকীত্ব থেকেও রোম্যান্টিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। আকাশ, ফুল দেখেও মনে রোম্যান্টিকতা জাগে। নাটকে রোম্যান্টিক অভিনয়ের ক্ষেত্রে 'অনুপান' খুব জরুরি। যাঁরা সোনার গয়না তৈরি করেন তাঁরা জানেন কতটা সোনা আর কতটা খাদ মেশাতে হয়। এটাই অনুপান। এই মাত্রাজ্ঞানটা খুব জরুরি।

প্রশ্ন : নিজের কাজকে বাঁচিয়ে রাখতে আর একটা ঊর্মিমালা বসু তৈরি করতে চান না?

ঊর্মিমালা বসু : কেউ কারোর মতো হয় না। সেক্ষেত্রে আর একটা ঊর্মিমালা কেন তৈরি করব? এখন তো নবীন কিশোরদের ছেড়ে দেওয়ার সময়। আমাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'কথানদী'-তে নতুনদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নতুনরা খুব ভালো কাজ করছে।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় বেতার নাটক ও শ্রুতি নাটকের জনপ্রিয়তা কমছে? তার জন্য দায়ী টেলিভিশন?

ঊর্মিমালা বসু : না, টেলিভিশন দায়ী নয়। দর্শক সবসময়ে ভালো নাটক শুনতে চান, তা সে বেতারেই হোক বা শ্রুতি নাটক। সমস্যা হল কোথাও ভালো কিছু হচ্ছে না। সব ক্ষেত্রে একটা নকল করার চেষ্টা হচ্ছে। নকল করে বেশিদূর যাওয়া যায় না। দর্শকরা চান বিনোদনে বৈচিত্র্য।

প্রশ্ন : আপনি খুব ঠান্ডা নাকি প্রতিবাদী?

ঊর্মিমালা বসু : আমি প্রতিবাদী চরিত্রের। যে কোনো অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করি, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাই করে যাব। এই তো দু-একদিন আগে বাজারে একটা জিনিস কিনতে গিয়ে দোকানদারের ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ করলাম। সবসময়ে আমি মেরুদণ্ড উঁচু করে চলি। কখনো সমঝোতা করি না। অন্তত অন্যায়ের সঙ্গে। গণআন্দোলনে পথে নেমেছি। অন্যায়ভাবে এক প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর ট্রোলের শিকার হয়েছিলাম।

প্রশ্ন : আপনি কোন রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী?

ঊর্মিমালা বসু : আমি বামপন্থায় বিশ্বাসী। যে দল এই রাজ্যে শূন্যে নেমে গেছে। কিন্তু মতবাদ কখনো শেষ হয় না।

প্রশ্ন : আপনার চোখে জগন্নাথ বসু কেমন মানুষ?

ঊর্মিমালা বসু : সুভদ্র, সৎ ও খুব ধূর্ত নন এমন এক মানুষ। আর জগন্নাথ বসুর কাজ নিয়ে বলবেন দর্শক-শ্রোতারা।

শীত শুরুর ফ্যাশন

কাব্য সেন

শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন। সত্যি, কার্তিক মাস পড়তেই মনটা নেচে ওঠে। বাতাসে হালকা শিরশিরানি, রাতের দিকে হিমের পরশ জানান দেয় শীতবুড়ো দোরগোড়ায়। তবে শীত যতই বুড়ো হোক, এর এক আলাদাই আমেজ। খাওয়াদাওয়া, ঘুরতে যাওয়া সব কিছুতেই যেন

স্বস্তি। সবথেকে মজার হল, শীতে মনের ইচ্ছে মতো ফ্যাশন, স্টাইল করা যায়। উজ্জ্বল রঙের সুন্দর পোশাক পড়তে বাধা নেই। একদিকে, প্যাঁচপেঁচে গরমের ভয় যেমন নেই আবার বৃষ্টিতে ফ্যাশন মাটি হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা নেই। তবে শীতের শুরুতে মানে ঠিক এই সময়টায় আমরা বুঝে উঠতে পারি না, ঠিক কীরকমের স্টাইল স্টেটমেন্ট হওয়া উচিত। কারণ, নভেম্বরের এই সময়টায় শীত পুরোপুরি আসে না। তাই এবারের সংখ্যায় রইল শীত শুরুর ফ্যাশনের হাল হদিশ।

স্লাগ : স্লাগ আজকের দিনে দারুণ স্টাইল স্টেটমেন্ট। যে কোনো পোশাকের সঙ্গেই স্লাগ ক্যারি করা যায়। তা সে শাড়িই হোক বা চুড়িদার কিংবা জিনস ও টপ। শর্ট ড্রেসের সঙ্গেও স্লাগ ব্যবহারের স্টাইল এখন ফ্যাশনে ভীষণভাবে ইন। স্লাগ বিভিন্ন মেটিরিয়ালের হতে পারে। কটনের যেমন সুন্দর, নানা ডিজাইনের স্লাগ নজর কাড়ে তেমনই নেটের স্লাগও মানানসই।

হালকা জ্যাকেট : এইসময় হালকা কটনের জ্যাকেট ব্যবহার করুন। তসরের জ্যাকেট যে কোনো ড্রেসের সঙ্গে ভালো মানাবে। জিনসের সঙ্গে এই ধরনের জ্যাকেট খুব ফ্যাশনেবল। এছাড়া কটনের নানা ডিজাইনের যেমন, কলমকারি, আজরাখের জ্যাকেটও এই হালকা শীতে পড়তে পারেন।

স্কার্ফ বা স্টোল : শীতের হালকা শিরশিরানি থেকে বাঁচতে এইসময় স্টোল ব্যবহার করতে পারেন। রঙ-বেরঙের নতুনত্ব ডিজাইনের স্টোল যে কোনো পোশাকের সঙ্গে ভালোই যায়। এছাড়া

গলায় জড়িয়ে নিতে পারেন স্কার্ফ। পোশাকের সঙ্গে ম্যাচিং করে স্কার্ফ পরলে তা ফ্যাশনেবল হতে পারে।

ফুল স্লিভস পোশাক : এইসময় ফুল স্লিভস পোশাক পড়ুন। জিনসের সঙ্গে ফুল স্লিভস শার্ট যেমন দারুণ মানাবে তেমনই ফুল হাতা কামিজ পড়তে পারেন। শাড়ির সঙ্গেও ফুল স্লিভস ব্লাউজ দারুণ স্মার্ট দেখায়।

হেঁসেল

তিন ধরনের বাঙালি পদের রেসিপি নিয়ে লিখছেন **পায়েল সামন্ত**।

দই এঁচোড়

উপকরণ : এঁচোড় ১ কেজি, জল সাড়ে ৬ কাপ, হলুদ গুঁড়ো ১ চামচ, নুন স্বাদ মতো, দেড়খানা পিঁয়াজ বাটা, পোস্ত বাটা ১ টেবিল চামচ, আদাবাটা ২ কাপ, টক দই ২ কাপ, ঘি হাফ কাপ, ধনে গুঁড়ো ৩ চা চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো ১ চামচ, গরমমশলা ১ চা চামচ।

পদ্ধতি : এঁচোড় কেটে নিন। এঁচোড় ৬ কাপ জলে সামান্য হলুদ গুঁড়ো দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। আদাবাটার সঙ্গে টক দই ভালোভাবে ফেটিয়ে নিন। এবার কড়াইতে ঘি গরম করে তাতে পেঁয়াজ বাটা দিয়ে কষে দিন। এরপর এঁচোড় দিয়ে তাতে দই দিন। সবকিছু ভালো করে কষুন। লঙ্কা গুঁড়ো মিশিয়ে তাতে বাকি হাফ কাপ জল দিন। ঝোল ফুটে উঠলে নুন ও গরমমশলা মিশিয়ে নামিয়ে নিন।

শিম দানা কই মাছের ঝোল

উপকরণ : কই মাছ ১০০ গ্রাম, সরষের তেল ৫০ গ্রাম, টমেটো দেড় চামচ, গোটা গরমমশলা ৫ গ্রাম, আদ, জিরে, লঙ্কা বাটা ১ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়ো ৫ গ্রাম, শুকনো লঙ্কা ৫ গ্রাম, শিমের দানা ৫০ গ্রাম, ধনেপাতা ১০ গ্রাম, নুন স্বাদ মতো।

পদ্ধতি : কই মাছ ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে তাতে নুন ও হলুদ মাখিয়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে মাছ ভেজে নিন। এবার ওই একই তেলে গরমমশলা ফোড়ন দিন। তাতে আদা, জিরে, লঙ্কা বাটা দিয়ে কষুন। দরকারে অল্প জল দিন। এবার এতে শিম দানা দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিন। শিম দানা ভাপিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে সব মাছ দিয়ে জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিন। নুন দিয়ে ওপর থেকে ধনেপাতা ছড়িয়ে ফুটিয়ে নামিয়ে নিন।

পমফ্রেট মাছের গঙ্গা যমুনা

উপকরণ : পমফ্রেট মাছ ৪টে, সাদা সরষেবাটা ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, কালো সরষে বাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়ো ১ চামচ, ৩-৪টে কাঁচা লঙ্কাবাটা, পেঁয়াজবাটা, তেঁতুলবাটা ২ চামচ, জিরেবাটা ১ চা চামচ, শুকনো লঙ্কাবাটা ১ চামচ, কাশ্মীরি মির্চ ১চা চামচ, সরষের তেল ১০০ মিলি, রসুন ১ চা চামচ, নুন স্বাদমতো।

পদ্ধতি : মাছে নুন ও হলুদ মাখিয়ে রাখুন। কড়াইতে তেল গরম করে তাতে কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে হলুদ ও লঙ্কাবাটা ও জল দিয়ে ফোটান। এবার অল্প আঁচে ঝোল ফুটিয়ে নামিয়ে রাখুন। অন্য কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজ বাটা ও অন্যান্য মশলা সহ নুন ও মিষ্টি দিয়ে জল দিয়ে ফুটিয়ে নিন। মাছ ভেজে নিয়ে দুটো গ্রেভি চামচে করে ঢেলে দিন।

রান্নাঘরের মুশকিল আসান

● বাসনে দাগছোপ থেকে গেলে বাসনের গায়ে বেবি অয়েল মাখিয়ে পেপার ন্যাপকিন দিয়ে মুছে নিন। বাসন নতুনের মতো চকচকে লাগবে। ● বাসনে গন্ধ হলে পাতিলেবুর রস মাখিয়ে রাখুন ৩০ মিনিট। তারপর ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিন আর ম্যাজিক দেখুন। ● রান্নাঘরে আরশোলার উপদ্রব হলে সিঙ্ক, জানলা, দরজার নীচে কয়েকটি তেজপাতা রেখে দিলে আরশোলা ভ্যানিশ।

কাছেপিঠে শীতের আমেজে পিকনিক

শীত মানেই পিকনিক। শীতে কাছেপিঠে ঘুরতে যাওয়ার বেশ কিছু জায়গা রয়েছে। যেখানে গিয়ে শীতের ছুটি উপভোগ করা যায়। আমাদের রাজ্যে এই রকম জায়গার অভাব নেই। এই বিভাগে আমরা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরব জেলাভিত্তিক পিকনিকের স্পট। এবার প্রথম পর্ব।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

পাহাড়পুর নেচারপার্ক : একেবারে কলকাতা শহরের বুকে পিকনিক করার আদর্শ জায়গা হল নেচার পার্ক। শিয়ালদহ-বজবজ শাখার ট্রেন ধরে ব্রেসব্রিজ স্টেশনে নামতে হবে। স্টেশনের বাইরে জিঞ্জিরা বাজার থেকে ১০ মিনিট হাঁটা পথে নেচার পার্ক। তারাতলা থেকে ১, ১২/১, এসটি-২৭ এর মতো অনেক বাস রয়েছে নেচার পার্কে যাওয়ার জন্য। পিকনিক করতে হলে এখানে মাসখানেক আগে থেকে গিয়ে বুকিং করতে হয়। মুদিয়ালি ফিশারম্যান কো-অপারেটিভ সোসাইটির তত্ত্বাবধানে রয়েছে এই পার্কটি। এখানে বোটিংয়ের আনন্দ উপভোগ করার পাশাপাশি ময়ূর, হরিণ, রাজহাঁস ও নানাধরনের পাখির দেখা মিলবে। পিকনিক স্পটটি যথেষ্ট বড়ো ও খোলামেলা। রান্না করে খাওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে।

ডায়মন্ড হারবার : জনপ্রিয় পিকনিক স্পটগুলোর মধ্যে অন্যতম হল ডায়মন্ড হারবার। হুগলি নদীর তীরে ডায়মন্ড হারবারে রয়েছে ইংরেজ আমলের ভাঙাচোরা কেল্লা। যদিও নোংরা-আবর্জনার জন্য কেল্লার মধ্যে ঢুকতে পারবেন না। কেল্লার আশপাশে খোলা আকাশের নীচে পিকনিকের আসর বসে। শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডায়মন্ড হারবারে বনভোজন করার জন্য অনেকেই ভিড় জমান। টাকা দিয়ে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। স্থানীয় পুরসভার উদ্যোগে পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা রয়েছে। পিকনিকের জন্য যোগাযোগ করতে হবে ডায়মন্ড হারবার পুরসভার সঙ্গে।

পূজালি পিকনিক পার্ক : বজবজ যাওয়ার পথে হুগলি নদীর তীরে রয়েছে পূজালি। এখানে নদীর তীরে গড়ে উঠেছে পিকনিক স্পট। পূজালি পুরসভার উদ্যোগে ইন্দিরা পার্ক তৈরি হয়েছে। এই পার্কের মধ্যে রয়েছে শিশুদের স্লিপ, দোলনা। পার্কে অনন্ত ৫টা পিকনিক স্পটরয়েছে। স্পট ভাড়া করার জন্য পূজালি পুরসভার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। পিকনিক করতে আসা লোকজনের মনোরঞ্জনের জন্য আলাদাভাবে গিনিপিগ ও পাখি রাখা আছে। নদীর পাড়ে বসলে চোখে পড়বে বড়ো-বড়ো জাহাজ। কলকাতা থেকে গাড়িতে তারাতলা, সেখান থেকে ডানদিকের রাস্তা ধরে অছিপুরের পূজালি গেস্ট হাউসটি মন কাড়বে।

ফলতা : কলকাতা থেকে প্রায় ৫১ কিলোমিটার দূরে হুগলি নদীর তীরে ফলতা। ধর্মতলা বা তারাতলা থেকে ফলতা যাওয়া যায়। রায়দিঘির বাসে গেলে দোস্তিপুর নেমে অটো বা ট্রেকারে চেপে ফলতা পৌঁছোনো যায়। গাড়ি ভাড়া করে গেলে ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে তারাতলা-বেহালা- ঠাকুরপুকুর-জোকা-আমতলা হয়ে ফলতা। এখানে হুগলি নদীর গা ঘেঁষে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর বাগানবাড়ি রয়েছে।

নূরপুর : হুগলি নদীর ধারে পিকনিক করার আর একটা মনোরম জায়গা হল নূরপুর। ধর্মতলা থেকে সরাসরি বাসে নূরপুর যাওয়া যায়। অথবা ডায়মন্ড হারবার, কাকদ্বীপ, নামখানাগামী যে কোনো বাসে চেপে এখানে পৌঁছোনো যায়।

ডাবু : মাতলা নদীর তীরে অন্যরকম পিকনিকের জায়গা। ডায়মন্ড হারবার, নূরপুরের মতো ক্যানিংয়ের ডাবু অতটা পরিচিত জায়গা নয়। ডাবুকে নিয়ে প্রচারও কম হয়েছে। তবে গাছগাছালিতে ঘেরা মাতলা নদীর তীরে শান্তশিষ্ট, নিরিবিলিতে পিকনিক করার একটা ভালো জায়গা এই ডাবু। শিয়ালদহ থেকে ক্যানিং লোকালে চেপে নামতে হবে ক্যানিং স্টেশনে। সেখান থেকে হাসপাতাল মোড় পেরিয়ে যাওয়া যায় ডাবু।

ভারতের হারের পেছনে কী মানসিক ক্লান্তি?

সৃঞ্জয় ঠাকুর

ভারতের হার যেকোনো সংস্করণে বিশ্বের অন্যতম সেরা ভারত। টি-টোয়েন্টিতে ভারতকে সমীহের চোখে দেখা হয়। আইপিএলের দেশ- যে ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রতিযোগিতা ২০ ওভারের ক্রিকেটকে অন্যমাত্রা দিয়েছে। যে লিগে খেলার জন্য মুখিয়ে থাকেন বিশ্বের তারকারা। যে লিগে টাকা ওড়ে, সবচেয়ে বড়ো কথা যে লিগের কারণেই ভারত পাচ্ছে টি-টোয়েন্টির সব সেরা ক্রিকেটারদের। সেই ভারতই যখন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের গ্রুপে টানা ২টি ম্যাচ হেরে যায়, তা সবাইকে অবাক করে। একটা দল হারতেই পারে। কিন্তু ভারত ক্রিকেটপ্রেমীদের অবাক করেছে হারের ধরনে। প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১০ উইকেটের হার, আর দ্বিতীয় ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৮ উইকেটের হার। এ ২টি হারে ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ভারত সেমিফাইনালের আগেই বিদায় নেওয়ার শঙ্কায় পড়েছে। ব্যাপারটা এমন নয় যে তাদের সেমিফাইনাল খেলা নির্ভর করছে পুরোপুরি গ্রুপের অন্য দলগুলোর ওপর। ক্রিকেটের কোনো বিশ্ব প্রতিযোগিতায় ভারত শেষ পর্যন্ত কবে এমন অবস্থায় পড়েছিল? ভারতের এই ব্যর্থতা নিয়ে চলছে নানামুখী কাটাছেঁড়া। সাবেক ক্রিকেটাররা নানা বিশ্লেষণ করছেন, কোহলি-রোহিত-লোকেশ রাহুল-যশপ্রীত বুমরাদে পারফরমেন্স নিয়ে চলছে এন্তার গবেষণা। তবে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে বাজে পারফরম্যান্সের মধ্যেও বল হাতে ভালো করা পেসার যশপ্রীত বুমরাহ জানান, হারের পেছনে মানসিক ক্লান্তি বড়ো কারণ। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মানসিক ক্লান্তির অনেক কারণ রয়েছে। গত মে মাস থেকে দলটা দেশের বাইরে। কোভিড-সংক্রান্ত বিভিন্ন কারণে দিনের পর দিন তাদের কাটাতে হয়েছে জৈব সুরক্ষাবলয় নামের 'কারাগার'-এর মধ্যে, যেখানে কোনো সামাজিক জীবন নেই, প্রথমে ইংল্যান্ডে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, এরপর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দীর্ঘ টেস্ট সিরিজ। মাঝে একটা দল তৈরি করে শ্রীলঙ্কায় পাঠানো হল সিরিজ খেলতে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলতে থাকা দলের খেলোয়াড়েরা চলে এলেন আরব আমিরাতে-আইপিএলে খেলতে, সেখানেও জৈব সুরক্ষাবলয়। এরপর টি- টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ক্রিকেটাররাও তো মানুষ- বুমরাহ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাজে পারফরম্যান্সের কারণ বলেছেন এটাকেই। ক্রিকেট দিনের শেষে একটা খেলাই। এ জন্য যদি ক্রিকেটারদের স্বাভাবিকক জীবন ছাড়তে হয়, তার একটা প্রভাব তো থাকবেই। বুমরাহ অবশ্য সরাসরি জৈব সুরক্ষাবলয় কিংবা ক্রিকেটসূচির দোষ দেননি। তবে মানসিক ক্লান্তির ব্যাপারটা তিনি লুকোননি। 'মাঝেমধ্যে বিশ্রামের দরকার হয়। টানা ৬ মাস ধরে খেলার মধ্যে থাকা সহজ নয়। আমরা ৬ মাস ধরে পথে পথে ঘুরছি। বিসিসিআই অবশ্য চেষ্টা করেছে আমাদের সর্বোচ্চ মানসিক স্বস্তি দিতে। কিন্তু মনের মধ্যে তো ক্লান্তি থাকেই। সূচি আমাদের হাতে নেই। এভাবে জৈব সুরক্ষাবলয়ের মধ্যে থাকলে মানসিক ক্লান্তি আসেই। কিছু করার নেই'। বুমরাহর এ মন্তব্য অনেক কিছুকেই সামনে নিয়ে এসেছে। দীর্ঘ সূচি শেষ না হতে হতেই আইপিএল, সেটি শেষ না হতে হতে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ক্রিকেটারদের যদি 'যন্ত্র' মনে করা শুরু হয়, তাহলে যা হবে, সেটাই হয়েছে ভারতের বেলায়।

হিন্দি ওয়েব সিরিজে শর্মিষ্ঠা আচার্য

নতুন হিন্দি ওয়েব সিরিজ বিপিও-র শুটিং চলছে। ওয়েব সিরিজের পরিচালনা করছেন ঋক। দিল্লির নয়ডার এক সত্যি ঘটনা অবলম্বনে ওয়েব সিরিজের গল্প তৈরি হয়েছে। চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক নিজে। গল্পটি হল, বিপিও-তে কাজ করা একটি মেয়ে 'এমপ্লয়ি অফ দ্য ইয়ার' হিসেবে পুরস্কৃত হয়। আচমকাই ওই মেয়েটি নিখোঁজ হয়ে যায়। এরপরের কাহিনি নিয়েই গল্পটি এগোয়। ওই মেয়েটির চরিত্রে অভিনয় করছেন টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শর্মিষ্ঠা আচার্য। তাঁর বিপরীতে রয়েছেন দেবপ্রসাদ হালদার। অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন সানা, ঋক, ইকবাল সুলতান, কমল মিশ্র, ফিরদৌস প্রমুখ। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন রঙ্গন চট্টোপাধ্যায়। ৫টি পর্বের এই ওয়েব সিরিজ দেখা যাবে অ্যামাজন প্রাইমে। জি সেভেন এন্টারটেইনমেন্ট নিবেদিত সিরিজটা প্রযোজনা করছেন সঞ্জয় চৌধুরী ও রবি আগরওয়াল।

উষসী যেন বিনোদিনী

স্টার জলসার জনপ্রিয় সিরিয়াল 'শ্রীময়ী'। সিরিয়ালের জুন আন্টি তথা অভিনেত্রী উষসী চক্রবর্তী এখন সোশাল মিডিয়ার সেনসেশন। সিরিয়ালে খলনায়িকা জুন আন্টির চরিত্রে উষসীর অভিনয়ে দর্শকরা মুগ্ধ। বয়স তিরিশের কোটা পেরোলেও মনে এখনো তিনি অষ্টাদশী। তাই চরিত্রের দরকারে কখনো ফুটবল খেলেছেন, কখনো হট লুকে সোশাল মিডিয়ায় উষ্ণতা ছড়ান। নিজেকে ফিট ও সুন্দরী রাখতে নিয়মিত শরীরচর্চা করেন। হাজার ব্যস্ততার মধ্যে দিনে কিছুটা সময় হলেও শরীরচর্চার জন্য বরাদ্দ উষসীর। অভিনয়, শরীরচর্চা সব কিছু সামলেও সোশাল মিডিয়ায় অ্যাক্টিভ এই অভিনেত্রী। সম্প্রতি সাদা জামদানিতে সাবেকি বাঙালি সাজে সোশাল মিডিয়ায় ঝড় তুললেন উষসী। সোশাল মিডিয়ার শেয়ার করা ওই ফটোসেশনে লাস্যময়ী উষসীর সেক্স অ্যাপিলও ধরা পড়েছে। সাদা জামদানিতে অনাবৃত তাঁর উর্ধাঙ্গ। কাঁধের ওপরে ছড়িয়ে থাকা ঘন কালো চুল। কাজল পরা মায়াবী দু'চোখ আর নাকে পাথরের চিলতে নথ। যা দেখে চোখের সামনে ভেসে ওঠে রবি ঠাকুরের চোখের বালির বিনোদিনী চরিত্র। ছবিটির ক্যাপশনে উষসী লিখেছেন, 'তার লাগি পথ চেয়ে আছি, পথে যে জন ভাসায়।' সম্প্রতি শ্রীময়ী সিরিয়ালের মেকআপ রুমে পর্দার স্বামী অনিন্দ্য ওরফে সুদীপ মুখার্জির সঙ্গে রোম্যান্টিক হিন্দি গানের তালে নাচতে নাচতে তাঁকে চূড়ান্ত ঘনিষ্ঠ হতেও দেখা গেছে। বাস্তবের উষসী চাইছে, এই রকমই সর্বনাশ হোক তার! তারই পথ চেয়ে বসে আছি।'